স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

৭১ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ২০ মে ২০১৯।। ৫ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

ধনেখালি: সিপিএমের ২ বুথ এজেন্টের বাড়িতে মারধর, বিজেপি কর্মীর বাড়ির সাম ...বাজি

বিক্ষিপ্ত অশান্তিতে

এগিয়ে ব্যারাকপুরই

নিজস্ব সংবাদদাতা

জঙ্গলরাজেই ফিরল ভোটের বাংলা

কেন্দ্রীয় ফৌজ সত্ত্বেও তৃণমূলের দাপটে ফেল কমিশনের মেশিনারিও

দমদমে বিজেপি কর্মীকে আক্রমণ হাসপাতালে দেখতে গেলেন প্রার্থী শমিক

শ্রীরামপুরে ভোটকেন্দ্রের সামনেই বিজেপির এজেন্টকে মারধর

ফাটল মুখ, রক্তাক্ত এজেন্টকে উদ্ধার করলেন প্রার্থী দেবজিত সরকার

ভোটের পরও জারি হিংসা

আরামবাগে সংঘর্ষে জখম ৬ ■ বোমাবাজি দত্তপুকুরে

ভোট হিংসায় বাংলা রয়েছে বাংলাতেই

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২০ মে - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

নেহরুর ভারতবর্ষের রূপ উন্মোচন করেছেন অতীশ তাসির, অর্মত্য সেনরা ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : ভোট শেষ বুয়া-ভাতিজার গল্প শুনুন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

কংগ্রেসের 'ন্যায়' প্রকল্প নিতান্ত দুর্বোধ্য ও সম্পূর্ণ অবাস্তব ▯ চেতন ভগৎ ▯ ৮

কর্মেও ফার্স্ট অপকর্মেও ফার্স্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকার ▯ অলোক সরকার ▯ ১১

শিশুসুলভ আচরণে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন রাহুল ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ১৩

কথাঞ্জলি ও চোখে আঙুল দাদার সওয়াল জবাব ▯ সৃজিত রায় ▯ ১৫

'জয় শ্রীরাম' গালাগালি হলে আরশোলাও পাখি ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৭

শাসকের নজির বিহীন সন্ত্রাসে রক্তাপ্লুত বাঙ্গলা ▯ ২৩

ভোটের দিনে তৃণমূলের সন্ত্রাস : দশ বছর আগের বিহারকেও হারিয়ে দিয়েছে ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৪

বাম নয়, ভোট সন্ত্রাসের জন্মদাতা কংগ্রেস ▯ শৈবাল মিত্র ▯ ২৬

ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের মূর্তিমান আতঙ্কের আরেক নাম সাধ্বী প্রজ্ঞা ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৮

আমায়নের কথা অমৃত সমান ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩১

জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টিধ্বনি ওঙ্কার ▯ শুভেন্দু সরকার ▯ ৩৩

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচন— অনেক এগিয়ে বিজেপি, পিছিয়ে তৃণমূল ▯ সনাতন রায় ▯ ৩৫

বন্দে মাতরমে ইংরেজ ভয় পেত, জয় শ্রীরামে দিদি ভয় পাচ্ছেন ▯ সরোজ চক্রবর্তী ▯ ৪৩

রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ ও রাজ্যবাসী ▯ ডা: মদনলাল চৌধুরী ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২**▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
২৭ মে
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
২৭ মে
২০১৯

পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ

পশ্চিমবঙ্গকে গণতন্ত্রের বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে শাসক দল তৃণমূল। তারা চায় না কোনও বিরোধী দল পশ্চিমবঙ্গে তাদের কর্মসূচী রূপায়িত করুক। পেশিশক্তির জোরে তারা বিরোধী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে চায়। সবাই দেখেছেন, নির্বাচন চলাকালীন কীভাবে বিরোধীদের বিশেষত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ওপর আক্রমণ করেছে তৃণমূল। সর্বভারতীয় নেতা থেকে শুরু করে বিজেপির অন্যান্য রাজ্যের নেতা, মুখ্যমন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীর জনসভা করতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল প্রশাসন। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে হয়রান করা হয়েছে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের। আগামী সংখ্যায় থাকবে তৃণমূলের এই সন্ত্রাসের একগুচ্ছ প্রতিবেদন।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

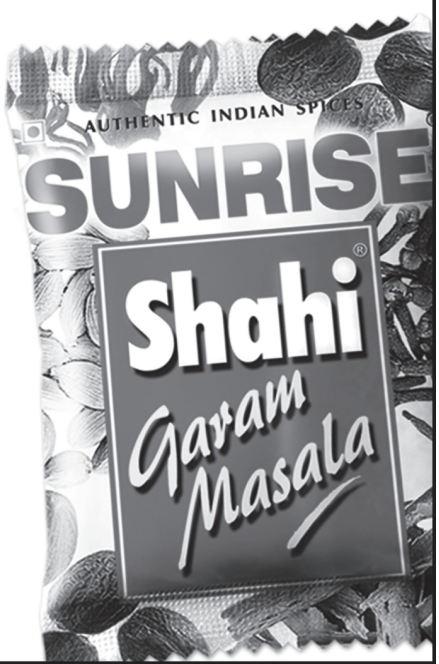
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কলুষিত গণতন্ত্রের মহোৎসব

ক্রমশ কলুষিত হইতেছে ভারতবর্ষের নির্বাচনী পরিবেশ। নেতা-নেত্রীদের মুখে অকথা-কুকথার বান ডাকিয়াছে। কালসর্পের গরল উদ্‌গীরণের মতো কু-কথার ফুলঝুরি ছুটিতেছে। ইহাতে একেবারে প্রথম সারিতে রহিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। তাঁহার মুখের এবং শরীরী ভাষাই বলিয়া দিতেছে ইহা নির্বাচনী প্রচারশৈলী নহে। ইহা অন্তরস্থ হিংসার বহিঃপ্রকাশ। তাঁহার মুখমণ্ডলই বলিয়া দিতেছে তিনি সেই হিংসার আগুনেই জ্বলিতেছেন। হিংসায় তিনি বেসামাল হইয়া বেলাগাম হইয়া পড়িয়াছেন। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের অবশ্য তিনি কোনওদিনই ধার ধারেন নাই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কোমরে দড়ি পরাইয়া ঘুরাইবেন বলিয়াছিলেন। এইবারেও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নানা অকথা-কুকথায় আক্রমণ করিয়াছেন। পরিশেষে সমস্ত সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রধানমন্ত্রীর থাপ্পড় মারিবেন এবং কান ধরিয়া উঠ-বোস করাইবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নির্বাচনী আবহে এতটাই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন যে, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিও তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এই ধ্বনিকে তিনি গালাগালি স্বরূপ মনে করিতেছেন। ধ্বনি প্রদানকারী তিন যুবককে তাঁহার নির্দেশে পুলিশ গ্রেপ্তার পর্যন্ত করিয়াছিল। হিংসার বিষবাষ্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহুবলীরা মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে। একশ্রেণীর পুলিশ-প্রশাসনকে তাহারা দলদাসে পরিণত করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে বিরোধীশূন্য করিবার প্রয়াসে মাতিয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও বহু স্থানে তাহারা মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিয়াছে। বহু স্থানে ভোট লুঠ করিয়াছে। গণতন্ত্রের এই মহোৎসবকে তাহারা রক্তাক্ত করিয়াছে, কলুষিত করিয়াছে।

বস্তুত নির্বাচনে সর্বপ্রথম হিংসা, ছলচাতুরি ইত্যাদির আমদানি করিয়াছে কংগ্রেস দল। কংগ্রেসের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে ভোট চুরি, ছাপ্পাভোট ও জালভোটের সংস্কৃতি প্রারম্ভ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রথম হইতেই কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা টিকাইয়ায় রাখিবার জন্য হিংসা এবং রাজনৈতিক বিদ্বেষ নিরন্তর চালাইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি হার্মাদ বাহিনী গঠন করিয়া বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ ৩৪ বৎসর পশ্চিমবঙ্গকে রক্তাক্ত করিয়াছে। কংগ্রেস ও বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে মাও-মার্ক্স-লেনিন-স্ট্যালিন সংস্কৃতির উর্বর ভূমি তৈয়ারি করিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসি ঘরানার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ হিংসার পরম্পরাকে শুধু দীর্ঘতরই করেন নাই, মাত্র সাত বৎসরেই সমস্ত সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অপমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। তিনি ইহার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন প্রবল হিন্দু বিদ্বেষ। ইহার ফলে উৎসাহিত হইয়া বিশেষ সম্প্রদায়ের গুন্ডারা হিন্দুদের আক্রমণ করিতেছে। কোথাও কোথাও সেই গুন্ডারা হিন্দু মহিলাদের বলাৎকারের হুমকি পর্যন্ত দিতেছে। এই পর্যন্ত কেবলমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সাতজন কার্যকর্তা রাজনৈতিক হিংসার বলি হইয়াছেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি ইহার মহড়া সারিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে ইহা সফল ভাবে প্রয়োগ করিলেন।

বিশ্বের নিকট ভারতের একটি উন্নত বিশ্বজনীন ভাবমূর্তি রহিয়াছে। তাহা অম্লান রাখিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের উপর রহিয়াছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ কয়েক দশক সেই প্রতিচ্ছবি ম্লান হইয়া গিয়াছিল। বিগত পাঁচ বৎসরে সেই ছবি পুনরায় বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সুষ্ঠু নির্বাচনে দেশ যোগ্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব লাভ করিয়া থাকে। নির্বাচন কালে দেশ ও দেশবাসীর উন্নয়নই একমাত্র বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইয়া এই বঙ্গভূমিতে অশালীন ভাষা, হিংসা, রক্ত, মৃত্যুর আমদানি করিয়া গণতন্ত্রের পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত করা হইতেছে। ইহাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মূক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তবু সকলেই আশা করিতেছেন এই ঘোর অমানিশা অচিরেই কাটিয়া দুষ্ট শক্তির পতন ঘটিবে এবং ভারতীয় গণতন্ত্র পুনরায় স্বমহিমায় এই বঙ্গভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

সুভাষিতম্

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

স্যাদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।। (মহাভারত)

যা ধারণ করে রাখতে পারে তাই ধর্ম। ধর্মই সমাজকে ধারণ করে রেখেছে। সেজন্য যদি কোনও কিছুর ধারণ করে রাখার ক্ষমতা থাকে তা নিঃসন্দেহে ধর্ম।

বিশ্বামিত্র-র

কলম

নেহরুয় ভারতবর্ষের রূপ উন্মোচন করেছেন আতীশ তাসির, অমর্ত্য সেনরা

মার্কিন সাপ্তাহিক টাইম ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক একটি প্রচ্ছদ সম্পর্কে অনেকেই অবগত আছেন। প্রচ্ছদে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে 'ইন্ডিয়া'স ডিভাইডার ইন চিফ' বা 'ভারতে বিভাজন নীতির মুখ্য কারিগর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সচরাচর একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে, অন্য দেশের কেউ এভাবে অপমান করলে অপমানিত দেশের রাজনীতিকরা অপমানকারীর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠতেন, একজোট হয়ে লড়াই করতেন। নেহরুয় ভারতবর্ষে অবশ্য সেসবের বালাই নেই, অন্যে অপমান করবে আমরা সেই অপমান সহ্য করব, অন্যে আমাদের দেশ আক্রমণ করবে, আমরা আমাদের ভূখণ্ডকে তাদের হাতে তুলে দেব— '৪৭-এর পর থেকে এসবে আমাদের অভ্যস্ত হতে হয়েছে।

নেহরুর দৌহিত্র পুত্রটি অবশ্য আরও এককাঠি ওপরে। সন্ত্রাসবাদীর জন্মদিন পালনে সোচ্চার হওয়ার যে অপূর্ব নিদর্শন, প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে দাঁড়িয়ে চোখ মারার যে অভূতপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন, তার ওপরে ঠাকুমার বাবার 'কালচারালি মুসলিম, এডুকেশনালি ইংলিশ' হওয়ার সাধ পূর্ণ করে কমিউনিস্ট দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন, নেহরু সাহেবও প্রকাশ্যে এহেন গলাগলি দেখাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। অতঃপর নেহরুয় ভারতবর্ষে আপনাকে স্বাগত। নচেৎ টাইম ম্যাগাজিনের আলোচনা ঠিক জমবে না। অমর্ত্য সেন অকপটে বলবেন না, 'মোদী ফের প্রধানমন্ত্রী হোক চাই না, কিন্তু হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে। 'নইলে বিদেশের মাটিতে সোনিয়া-পুত্র ভারতীয় নিরাপত্তাকে নস্যাৎ করে বিদেশি শাসকের তাঁবে আর মৌজ করবেন না। না হলে মাসুদ আজহার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীর তকমা পেলে চীন কী কী সুবিধা ভারত থেকে আদায় করবে, তাতে দেশের কতটা ক্ষতি হবে, এবং এর জন্য মাসুদের আন্তর্জাতিক তকমার আর দরকার নেই, এমন অর্বাচীন বাক্যও তো অশ্রুতপূর্ব থাকবে। মিডিয়ার দালালিও যে আর চলবে না! এটাই তো নেহরুয় ভারত। যার একমাত্র শত্রু নরেন্দ্র মোদী।



ফলে টাইম ম্যাগাজিনে আতীশ তাসির বলে একজন যখন লেখেন 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র কি আরও পাঁচ বছরের জন্য মোদী সরকারকে সহ্য করতে রাজি?' তখন তো আমাদের উল্লাস প্রকাশ করতেই হয়, গণশক্তি নামক কমিউনিস্ট মুখপত্রের প্রথম পাতায় গোটা হরফে লিখতেই হয় 'দেখছে দেশ, বলছে বিদেশি মিডিয়াও', এই না হলে নেহরুয় ভারত। মোদীর ভারত থেকে যে ভারতে আমাদের প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য 'বাজারি'য় সংবাদপত্রের বুদ্ধিজীবীগণের এত আকুলতা। কে এই আতীশ তাসির? পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ সলমন তাসির, যিনি শেষ জীবনে পাক-শাসিত পঞ্জাবের গভর্নর হয়েছিলেন তাঁরই সুপুত্র। তিনি ২০১১ সালের ১৬ জুলাই ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে তাঁর মহান পিতৃদেবের সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন : 'আমার বাবা কেন ভারতবর্ষকে ঘৃণা করতেন?' সেই অসামান্য প্রবন্ধে নেহরুয় ভারতবর্ষের কী যে অকল্পনীয় রূপ ফুটে উঠেছিল তা বলা যায় না। তাসির লিখেছিলেন : 'ভারতের প্রতি পাকিস্তানের ঘৃণার কারণ, একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় দ্বারা, এই মৃগীরোগের (হিস্টিরিয়া) হেতু বুঝতে হবে। ভারতের সংস্কৃতি, অতীতের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে পাকিস্তানিদের ভারতকে বর্জনের উদ্দেশ্য। পাকিস্তান নির্মাণ ধারণার হৃদয় থেকে যার উৎস।' সত্যি কথা বলতে কী এই হলো নেহরুয় ভারত। কাশ্মীরে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা উদ্বাস্তু হবেন, ভিটেমাটি ছেড়ে পথে বসবেন। আর সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাবেন। সঙ্গে ফ্রি এন্টারটেনমেন্ট ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর ওপর পাথর ছোঁড়া কিংবা লাশ গোনা।

সত্যি কথা বলতে কী স্বাধীনতার পর কম বেশি ৬০ বছর আমরা এমনটিই দেখেছি। প্রথমে বাজপেয়ী সরকারের পোখরান, কার্গিল, পরে মোদীর আমলে এই যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ডান্ডা মেরে দুষ্কৃতীদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া এসব নেহরুর শান্তিকামী ভারতের পক্ষে সাজে না। তাই আতীশ তাসির কিংবা অর্মত্য সেনের কথাই নেহরুয় ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্য। ফলে আতীশ তাসির সেই 'বিভাজন'কারী প্রবন্ধে একেবারে ঠিক বলেছেন নরেন্দ্র মোদীর ২০১৪-য় লোকসভা নির্বাচনে জয় 'ভারতের জাতীয় বিপর্যয়'। এতটাকাল সযত্নে নেহরুয় ভারতের সত্তা লালিত-পালিত হচ্ছিল, ন্যুব্জ, কুব্জ ভারতবর্ষের হতদরিদ্র চিত্র আর মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর মিলিত সংস্কৃতির ভারতবর্ষে মোদী এসেছে কোথাও একটা সজোরে ধাক্কা দিয়েছেন তাতে। আর এর ফলেই উঠে পড়েছে ত্রাহি ত্রাহি রব, ইসলামি সংস্কৃতি আর ব্রিটিশ শিক্ষা ফিরিয়ে আনার আর্তি ও আর্তনাদ, 'অ্যাক্সিডেন্টালি' হিন্দুদের দগদগে ক্ষতে যা বুলোতে আতীশ তাসিররা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। 'দেশ দেখছে, বিদেশি মিডিয়াও বলছে।' ■

ভোট শেষ বুয়া-ভাতিজার গল্প শুনুন

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

ভোট পর্ব শেষ। ফলের অপেক্ষা। এই ফাঁকে শুনে নিন পিসি-ভাইপোর গল্প। হাড় হিম করা কাহিনি। বুয়াই বলেছেন কীভাবে ভাতিজা এলেন পলিটিক্সে।

পিসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্তমাখা ছবি দেখে শৈশবেই রাজনীতিতে আগ্রহ তৈরি হয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নির্বাচনী প্রচার মঞ্চ থেকে তিন দশক আগের সেই গল্প শোনালেন তৃণমূলনেত্রী।

তৃণমূল নেতৃত্বের উপরে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ নিয়ে কথা বলতে গিয়েই অভিষেক প্রসঙ্গ টেনে আনেন মমতা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝাড়গ্রামে 'ভুল বোঝাবুঝি' হয়েছে বলে মন্তব্য করে মমতা বলেন, ''নেতা তো আকাশ থেকে তৈরি হয় না। আর বাঙ্গলার নেতা দিল্লি থেকে তৈরি হয় না। গ্রামগঞ্জ থেকেই তৈরি হয়। ভালো ছেলে মেয়ে এগিয়ে আসুক। আমি পলিটিক্সে ভালো ছেলে মেয়ে প্রমোট করতে চাই। কিন্তু আপনারা যদি এগিয়ে না আসেন তবে কী করে হবে? আপনাদেরও তো এগিয়ে আসতে হবে।''

এর পরেই মমতা টেনে আনেন তাঁর পরিবারের কাহিনি। বলেন, ''ইন্দিরা গান্ধী যখন মারা যান সেই সময়ে পাড়া থেকে বের হলে পাড়ার সিপিএমের লোকেরা বলত, পাড়া থেকে বেরোচ্ছো বেরোও, ঢুকতে দেব না পাড়ায়। সেই সব হুমকির দিনে আমার যত ভাই-বোনেরা আছি বাড়িতে আমরাই মিছিল করতাম। আজকে নয়, আমাদের পরিবারের সকলেই শুরু থেকে পলিটিক্স করে। নেতা হওয়ার জন্য নয়। আমরা শুধু একজনকেই নিয়ে এসেছিলাম কারণ, সেও নিজে চায়নি। আমি বলেছিলাম, তোরা যদি ইয়াং জেনারেশন না আসিস তবে পলিটিক্সটা করবে কে? আমি তো একদিন হারিয়ে যাব। একদিন বড়োরা চলে যাবে, ছোটোদের তো আসতে হবে।''

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিতে আসা নিয়ে বলতে গিয়ে মমতা বুঝিয়ে দেন তিনি শুধু নিজের পরিবার নয়, দলের অন্য নেতাদের ছেলে-মেয়েদেরও রাজনীতিতে চান। মঞ্চে থাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, ''আমি তো বলি, পার্থদার মেয়ে এত টাকা মাইনে নিয়ে কেন বিদেশে ঘোরে, দেশের মাটিতে কাজ করুক। সুব্রত বক্সিকেও বলি, ছেলেকে পলিটিক্সে দাও। পলিটিকাল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ভালো রাজনীতিক তৈরি হয়।'' এই প্রসঙ্গে শিশির অধিকারীর ছেলে শুভেন্দু অধিকারী, ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজীব গান্ধীর রাজনীতি করার উদাহরণও দেন মমতা।

এর পরেই মমতা বলেন কীভাবে রাজনীতিতে এলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গল্প বলার ভঙ্গিতে বলেন, ''যখন ১৯৯০ সালে আমায় মারল। আমার মাথা পুরো ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। আমি হাসপাতালে ছিলাম প্রায় তিন মাস। ও (অভিষেক) আমার রক্তাক্ত অবস্থার ছবি দেখেছিল। তখন ওর দেড় দু'বছর বয়স। আমার হাত, পা, মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে ও ভয় পেত। আর একটা পতাকা নিয়ে মিছিল করত, দিদিকে মারলে কেন, জ্যোতি বাবু জবাব চাই, জবাব দাও। ওই করে মিছিল করত। ওই করতে করতে ওর মাথায় একটা ঢুকে গিয়েছিল যে আমি দিদির সঙ্গে থাকব। এটাই ওর পলিটিক্স করার মেন ইনটেনশন অন্য কিছু নয়।''

ঝাড়গ্রামের প্রচারে গিয়ে হঠাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিতে আসার গল্প কেন শোনালেন মমতা? স্বাভাবিক ভাবেই এমন প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। একাংশের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাবে বারবার 'বুয়া-ভাতিজা' প্রসঙ্গ টেনে পরিবার রাজনীতির অভিযোগ তুলছেন এদিন তারই জবাব দিলেন মমতা। একই সঙ্গে দলের মধ্যেও অভিষেককে নিয়ে থাকা ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টাও রয়েছে তৃণমূলনেত্রীর।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন নিয়েই ভোটের ফলের অপেক্ষা করুন। ফল প্রকাশ হলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে ভাইপোকে বাঁচাতে কেন মরিয়া পিসিমণি।

— **সুন্দর মৌলিক**

কংগ্রেসের ‘ন্যায়’ প্রকল্প নিতান্তই দুর্বোধ্য ও সম্পূর্ণ অবাস্তব

অতিথি কলম



চেতন ভগত

বেশ অনেক দিন পর আবার একটা ‘পাশা পাল্টে’ দেওয়া চাল পাওয়া গেল কংগ্রেসের কাছ থেকে। এর নাম সকলেই জানেন NYAY (ন্যূনতম আয় যোজনা) Minimum Wage Scheme। উদ্দেশ্য দেশের ৫ কোটি গরিব পরিবারকে বছরে ৭২ হাজার টাকা করে দান দেওয়া। বরাবর অর্থাৎ আজীবন। কংগ্রেসের সভাপতি প্রকল্পটি ঘোষণা করা মাত্রই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের হেডলাইন হয়ে যায়। অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘোষণা কংগ্রেস দলকে রাজনৈতিক অস্ত্র সরবরাহে সহায়ক হবে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার এই প্রকল্পটি নিয়ে যে ধরনের সাড়া পড়ে গেছে তাতে করে মনে হয় কেন্দ্রে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন এই ধরনের কোনও একটা প্রকল্প রূপায়ণের চেষ্টা হবে। মাত্র কয়েক মাস আগেই মোদী সরকার একই ভাবে বছরে ৬ হাজার টাকা চাষিকে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যেই দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু আপাতভাবে ৬ হাজার আর ৭২ হাজারের বড়ো ফারাক তো সকলেই বুঝবেন। আমরা এর অর্থনৈতিক টানাপোড়েন নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করব।

‘ন্যায়’ প্রকল্পের টাকা কোথা থেকে জোগাড় হবে সে বিষয়টা ভাবার আগে আমরা এর নৈতিক অবস্থানটা দেখব। এর ভালো খারাপ দুটোই আছে। ভারতে নিশ্চিতভাবেই বেশ বড়ো সংখ্যায় বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ বাস করে। তাদের পকেটে টাকা পয়সা কিছু না থাকায় তারা দারিদ্র্যের জাল কেটে বেরোবার কোনও রাস্তাই খুঁজে পায় না। এই টাকাটা মাসে মাসে হাতে পেলে তারা কিছুটা ভাবতে পারবে যে ভালো খাবার না ভালো বাসস্থান না সন্তানের শিক্ষা জীবনযাত্রার কোন বিষয়ে তারা অগ্রাধিকার দেবে। সরকার কখন তার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটাবে তার জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষায় না থেকে হাতে কিছু নগদ থাকলে নিজেই কিছু না কিছু করার আংশিক স্বাধীনতা অন্তত পাওয়া যেতে পারে। দেশ ব্যাপী আলোড়ন তোলা প্রতিযোগিতামূলক ‘ঋণ মকুব প্রক্রিয়াতে’ যদি এর মাধ্যমে ইতি টানা যায় তাহলে ঋণমুকুবের হিড়িক যেভাবে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, ঋণদানের সংস্কৃতিকে সরাসরি ধ্বংস করে দিচ্ছে তা একটা নৈতিকভাবে ইতিবাচক দিকের সন্ধান দিতে পারে।

অন্যদিকে দুটি নৈতিক বন্ধু কিন্তু ঘোরতরভাবে ‘ন্যায়ের বিপক্ষে যাচ্ছে। সরকার দেশের করদাতাদের একটা বিরাট আকারের টাকা চিরকালীন ভরতুকি খাতে খরচা করার বন্দোবস্ত করছে সে বিষয়ে করদাতাদের সম্মতি আছে কিনা। দ্বিতীয়ত, মুফতে পয়সা হাতিয়ে নেওয়া

> “মারপ্যাঁচ করে কাগজে কলমে হয়তো হিসেব মেলানো যাবে কিন্তু এর ফলশ্রুতি দেশের অর্থনীতিকে বহুমুখী আঘাত করবে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হ্রাস পাবে, বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি, দেশের বিনিয়োগে ভাটা পড়বে, আয়কর চাপানো হবে বর্ধিত হারে। আর হ্যাঁ, চাকরি ও চাকরির আশা কমে যাবে ভয়ংকর ভাবে।”

সমাজে কর্মসংস্কৃতিকে নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের অন্যায্য অধিকারবোধের জন্ম দেবে যা সরাসরি দেশের শ্রমজীবীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভারতের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ইতিমধ্যেই কম, ‘ন্যায়’ তার অপূরণীয় ক্ষতি করবে।

যাই হোক, নীতিগতভাবে ‘ন্যায়ের’ ভালো মন্দ দু’টো দিক পর্যালোচনার পর মনে হতেই পারে ভারতের মতো দরিদ্রতম দেশে ‘ন্যায়’ কিছুটা উপকার হয়তো করতে পারে। কিন্তু আসল বিষয়টি হলো এর অঙ্গীভূত অর্থনীতি ও বাস্তবে প্রকল্পটি কীভাবে রূপায়িত হবে সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি।

প্রথম, দেশ হিসেবে আমাদের কি এর রূপায়ণ ক্ষমতা আছে? অর্থনীতির মহা পণ্ডিত না হয়েও বলা যায় যে, দেশের ৫ কোটি পরিবারকে বছরে ৭২ হাজার টাকা করে দিলে ৩.৬ (তিন লক্ষ ষাট হাজার) কোটি টাকা লাগবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ এক বিশাল অঙ্কের টাকা। সরকারের সামগ্রিক কর বাবদ আদায় হয় ১৮ লক্ষ কোটি টাকা, এর এক পঞ্চমাংশ কেবলমাত্র এই প্রকল্প হজম করে নিতে পারে। আজকের তারিখ অবধিও সরকার যে পরিমাণ আয় করে তার খরচ তার চেয়ে বেশি। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এই বাড়তি গগনচুম্বী খরচ দেশের সমগ্র বাজেট প্রস্তাবকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারে। সাধারণের দৃষ্টিতে বিষয়টা এরকম দাঁড়ায়। ধরা যাক একজন লোক ১৮ হাজার টাকা আয় করে, তার মাসিক খরচ ২০ হাজার টাকা। ২ হাজার টাকার ঘাটতি ক্রেডিট

কার্ডের মাধ্যমে চালায় যা কয়েকমাসে যে পর্যায়ক্রমে শোধ করতে থাকে। কালকে এই লোকটিকে বলা হলো তোমার খরচ আগামী মাস থেকে ২৪ হাজার টাকা হয়ে যাবে। আয় তো একই থাকবে। হঠাৎ আয়-ব্যয়ের হিসেবে নাটকীয়ভাবে বড়ো ধরনের ফারাক তৈরি হয়ে গেল যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এর মানে দাঁড়ালো ক্রেডিট কার্ডে খরচ চালানোর বিল যা ইতিমধ্যেই বেড়ে চলেছিল তা আরও বেড়ে গেল। ব্যক্তির ক্ষেত্রের উদাহরণ দেওয়া হলো। সরকারের কাছে বাজেটের নিরিখে আয়ের চেয়ে বেশি খরচা মানেই বাজার থেকে ধার করা। ধার বাড়ানোর অর্থই হচ্ছে চলতি সুদের হারও বেড়ে যাওয়া। টাকা পেতে যদি বেশি সুদ গুনতে হয়ে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ ধাক্কা খাবে। যেহেতু বাজারে বাড়তি টাকা জোগান দিতে হবে (কেননা সরকারের অর্জিত আয় আগেই খরচ হয়ে গেছে) টাকা ছাপিয়ে (Deficit financing) ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। যার ভয়ঙ্কর পরিণতি মুদ্রাস্ফীতি। হ্যাঁ ভাই, জীবনে কোনো কিছুই ফোকটে আসে না। নগদ টাকা তো নয়ই।

অবশ্যই আমরা রাজস্ব আদায়ে বৃদ্ধি ঘটিয়ে ঘাটতিকে বাগে আনতে পারি। কীভাবে করবে সরকার? কতই না পরিচিত সহজ রাস্তা রয়েছে— (১) সরকার দুম ধাড়াক্কা আয়করের হার বাড়িয়ে দিতে পারে বা দেশের cess-দগ্ধ জনতা অচিরেই NYAY Cess দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যেতে পারে। কর্পোরেট সেক্টর যে কোনও সময় কর বৃদ্ধির বলির পাঁঠা হয়ে যেতে পারে। এর পরিণতিতে ভারতের পণ্য বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। বাড়তি কর দিলে উৎপাদিত পণ্যের দামও বাড়াতে হবে। নইলে তার বাজেট ধসে যাবে।

কিছু ক্ষেত্রে এখনই চালু জিএসটি-র হার চড়া আছে তা নিয়ে কতই না বুক ফাটাফাটি হচ্ছে, কিন্তু এর ওপর বাড়তি ন্যায় দেন সে তো ব্যবসায়ীকে নোনা মুখে মেনে নিতেই হবে। এর সঙ্গে আরও বহু ক্ষেত্র থেকে দুম করে কর আদায় শুরু হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয় সরকারি খরচ বাঁচাতে অত্যাবশ্যক

“যে কোনও প্রকল্প যদি গরিবের উপকারে লাগে তাতে আপত্তির কী থাকতে পারে? কিন্তু ন্যায়ের মতো এত বিপুল একটা প্রকল্পে এটা দেখা জরুরি যে এই দান দিতে গিয়ে আমাদের কী কী হারাতে হবে। আর আদৌ তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব কিনা! যেখানে সব হিসেবেই জন্মসূত্রে কারচুপির সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে।”

ও দেশের পক্ষে দীর্ঘকালীন পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে কাটছাঁট শুরু হতে পারে।

রাস্তা কম তৈরি হবে, স্বাস্থ্যখাতে খরচ ছেঁটে দেওয়া হবে। শিক্ষা খাতে খরচ কমিয়ে দেওয়া তো হাতের পাঁচ। এর থেকে টাকা নিয়ে ‘ন্যায়’ বাঁচাতে হবে।

হ্যাঁ, আবার বলছি, যতই খারাপ লাগুক না কেন দুনিয়ায় বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না, কিছু না। আর এত বিশাল অঙ্কের টাকা তো ভাবাই যায় না। চিন্তার কিছু নেই ভারতের তো অতীতের কলঙ্কিত অভিজ্ঞতা আছেই। যত বেশি কর চাপবে তত বেশি কর ফাঁকি বাড়বে। বলতে কোনও বাধা নেই গত পাঁচ বছরে এই ফাঁকিবাজরা কিছু একটি গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য রক্ষাকারী কর জমানায় এই প্রবণতা থেকে সরে এসেছেন।

MGNREGA বা ছোটো করে ‘মনরেগা’ প্রকল্পই এ পর্যন্ত ভারতে ঘোষিত সর্বাধিক ৫০ হাজার কোটি টাকার ফি বছরে খরচের প্রকল্প। প্রস্তাবিত ন্যায়ের বহর হবে এর ৭ গুণ বেশি। তাহলে কি দেশ এই খরচ বইতে পারবে? হ্যাঁ, মারপ্যাঁচ করে কাগজে কলমে হয়তো হিসেব মেলানো যাবে কিন্তু এর ফলশ্রুতি দেশের অর্থনীতিকে বহুমুখী আঘাত করবে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হ্রাস পাবে, বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি, দেশের বিনিয়োগে ভাটা পড়বে, আয়কর চাপানো হবে বর্ধিত হারে। আর হ্যাঁ, চাকরি ও চাকরির আশা কমে যাবে ভয়ংকর ভাবে।

সবচেয়ে বেশি যেটা মাথায় রাখতে হবে তা হলো বাস্তবে এর সঠিক প্রয়োগযোগ্যতা। নির্দিষ্ট সীমার আয়ের মানুষের মধ্যে আয়করের রিটার্ন দাখিল করার ফলে বিশেষ করে চাকুরি ও সুদ আয়কারীদের ক্ষেত্রে টিডিএস বা উৎসমূলে কর কাটার সূত্রে সরকার দেশের মানুষের রোজগার সম্পর্কে জানতে পারে। ‘ন্যায়’ প্রকল্পে আয়ের যে মানদণ্ড ধরা হয়েছে অর্থাৎ ১২ হাজার টাকা, সে ক্ষেত্রে যে Auto driver ১৭ হাজার টাকা আয় করে সে গিয়ে অনায়াসে আয় ১২ হাজার টাকার নীচে দেখাবে না তো কী করবে? মুফতে ভরতুকি পেতে হলে এটাই তো রাস্তা। যে আধিকারিক তাকে এই জাল সার্টিফিকেট দেবে যার ফলে ৭২ হাজার তার খাতায় যাবে সে কি করবে মনে হয়? তাকে তো হাত গরম করতেই হবে। চমৎকার!

একজন ভারতীয় হিসেবে আপনি সহজেই ভাবতে পারছেন যে প্রতিষ্ঠান ও সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামোর কতটা অপব্যবহার শুরু হবে এই ধরনের যোগ্যতা সার্টিফিকেট দিতে। সত্যিই বলছি এর কোনও সদুত্তর আমাদের জানা নেই যার মাধ্যমে এই প্রতারণাকে আটকানো যেতে পারে।

যে কোনও প্রকল্প যদি গরিবের উপকারে লাগে তাতে আপত্তির কী থাকতে পারে? কিন্তু ন্যায়ের মতো এত বিপুল একটা প্রকল্পে এটা দেখা জরুরি যে এই দান দিতে গিয়ে আমাদের কী কী হারাতে হবে। আর আদৌ তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব কিনা! যেখানে সব হিসেবেই জন্মসূত্রে কারচুপির সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে।

(লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

রম্যরচনা

ভয়ে শ্রীরামপুর বলতে পারিনি

কন্ডাক্টর : দাদা আপনার টিকিটটা?

পাসেঞ্জার : একটা 'লক্ষ্মণের দাদা পুর' কাটুন।

কন্ডাক্টর : (অবাক হয়ে) মানে? এটা আবার কোন জায়গা? আমাদের বাস এরকম কোথাও যায় না।

পাসেঞ্জার : (কাচুমাচু হয়ে) তাহলে একটা 'দশরথের ছেলে পুর' কাটুন।

কন্ডাক্টর : (রেগে গিয়ে) কী আবোল তাবোল বকছেন? যান বাস থেকে নেমে যান।

পাসেঞ্জার : (ভয়ে ভয়ে) বলছিলাম তাহলে 'সীতার স্বামী পুর কাটুন'।

কন্ডাক্টর : আচ্ছা পাগল তো আপনি? কী সব উলটো পালটা বকছেন?

পাসেঞ্জার : আপনার কানে কানে বলছি, আমাকে একটা শ্রীরামপুরের টিকিট দিন।

কন্ডাক্টর : (বিরক্ত হয়ে) সেটা তো ভালো ভাবে বললেই হতো।

পাসেঞ্জার : দাদা, ভয়ে শ্রীরাম বলতে পারিনি। যদি জেলে পুরে দেয়!



উবাচ

"প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একতরফা স্টোরি লিখার জন্য টাইম পত্রিকার লজ্জা হওয়া উচিত। পশ্চিমি দেশগুলির মতে মোদী যদি বিভাজনকারী হন, তাহলে ভারতের একতার ঠিকাদার কারা? মমতা, মায়াবতী, বামপন্থীরা, ওমর আব্দুল্লা বা প্রিয়াঙ্কা বঢরা?"



তারিক ফতেহ্
পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত মার্কিন লেখক

টাইম পত্রিকার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো প্রসঙ্গে

"দিদির মতো 'কন্ট্রাক্ট প্রাইম মিনিস্টার' নয়, নরেন্দ্র মোদীর মতো 'পারফেক্ট প্রাইম মিনিস্টার' চায় দেশ।"



মুকতার আব্বাস নকভি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে

"নির্বাচনের সময় ছাড়া আমাকে কদাচিৎ কোনও দল বা তার নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখবেন, যদি না বিরোধীদের কেউ মন্তব্য করেন এবং আমাকে তার জবাব দিতে হয়। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকে আমার ভাষণগুলো লক্ষ্য করলেই এটা দেখতে পাবেন। এটা আমার অঙ্গীকার, এমনকী সংসদেও।"



নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

এক ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে

"মাথা খারাপ হয়ে গেছে দিদির। যিনি বাঙ্গলাকেই সামলাতে পারেন না, তিনি আবার দেশ চালাবেন! দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। শুধু বোমা তৈরির কারখানা হবে।"



ভারতী ঘোষ
ঘাটালে বিজেপি প্রার্থী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবি প্রসঙ্গে

কর্মেও ফার্স্ট অপকর্মেও ফার্স্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকার

অলোক সরকার

গত সাত বছর ধরে বাঙ্গলার উন্নয়নের পালে হাওয়া লেগেছে। সে হাওয়া কেমন? গর্ব করার মতোই। গ্রাম বাঙ্গলার ৪০ লক্ষ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বসবাসের মতো ঘর। খরচ হয়েছে ১৮,৩৬১ কোটি টাকা। একশো দিনের কাজের প্রকল্পে সৃষ্টি হয়েছে ৩১.৫৬ কোটি কর্মদিবস। নব্বই লক্ষ গ্রামীণ গৃহস্থের জন্য ১৮৯ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে অন্য প্রকল্পে। ছ' হাজার কোটি টাকা ঋণদানের মাধ্যমে ৬৭ লক্ষ গ্রামীণ মহিলার উপার্জনের ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামগঞ্জে রাস্তা হয়েছে ৭১ হাজার কিলোমিটার। ৯৯.৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে স্যানিটারি শৌচালয় গড়ে দেওয়া হয়েছে। ১.৭১ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। জাতীয় স্তরে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ছ' ভাগের এক ভাগ গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে আর সেই সব শিল্পে মহিলা কর্মী নিয়োগ হয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক। রাজ্যের কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে গত সাত বছরে ৪৪ শতাংশ। জাতীয় স্তরের পুরস্কার মিলেছে কৃষি সম্মান যোজনায়। আন্তর্জাতিক পুরস্কার মিলেছে কন্যাশ্রী প্রকল্পে। রাজ্যের মোট উৎপাদন (জিএসডিপি) ছুঁয়েছে ১৫ শতাংশের স্তর। জাতীয় স্তরে তা এই মুহূর্তে ৮.৫ শতাংশ। খাদ্যসাথী প্রকল্পে ৮.৫৯ কোটি মানুষকে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকের ঘরে পৌঁছেছে দু' টাকা কেজি দরের চাল। সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। ২৯৪ কোটি টাকা খরচে আই টি পরিকাঠামো বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ গুণ। এক হাজারটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়া হয়েছে। নতুন ১০টি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। ১৬টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। ৪৭টি নতুন কলেজ হয়েছে। অণ্ডালে দেশের প্রথম বেসরকারি স্তরে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর গড়ে তোলা হয়েছে। ১৮৬টি কৃষক বাজার গড়া হয়েছে ১,১৭১ কোটি টাকায়। গড়ে উঠেছে দেশের প্রথম মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক মধুরস্নেহ। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছোটো ও মাঝারি শিল্প গড়ে ওঠেছে গত ৭ বছরে। সংখ্যায় যা দেশের মোট শিল্পসংস্থার ১১.২৬ শতাংশ। ওইসব শিল্পে কাজ মিলেছে ১,০৯,১৫,৬২৬ জনের। ২০০ একর জমি ঘিরে গড়ে উঠছে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি। ছোটো ও মাঝারি শিল্প এবং নতুন স্টার্টআপ প্রকল্পগুলিকে সাহায্য দানের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ২০০ কোটি টাকার কার্পাস ফান্ড। আর সবচেয়ে বড়ো খবর— রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার দেওদা পাঁচামি হরিণসিংহ দেওয়ানগঞ্জে গড়ে উঠছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি।

না, রাজ্য সরকার স্বীকার করে না, এসব প্রকল্পের সিংহভাগই সম্ভব হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায়। রাজ্যের মানুষও তা জানতে পারেন না, কারণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নামবদল করেছে রাজ্য সরকার। যেমন 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা' হয়েছে 'বাংলা গ্রাম সড়ক যোজনা'। 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' প্রকল্পের নাম হয়েছে 'মিশন নির্মল বাংলা।' 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প' (যে প্রকল্পে দু' টাকা কেজি চাল দেওয়া হয়— কেন্দ্র ভরতুকি দেয় প্রতি কেজি চালে ২৯ টাকা ৬৪ পয়সা, রাজ্য দেয় কেজি প্রতি ১ টাকা) হয়েছে 'খাদ্যসাথী' ইত্যাদি। তবু না হয় মেনে নেওয়া গেল— কাজ তো হয়েছে! আর আমরা এমন নিন্দুক নই যে, যেখানে রাজ্য সরকার কৃতিত্ব দেখিয়েছে, যেখানে রাজ্য সরকার দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সেই সব কৃতিত্বকেও জোর করে খাটো করে দেখাব। সত্যকে অস্বীকার করার চেয়ে বড়ো পাপ আর কিছু নেই।

> **সংখ্যালঘু ভোটের কাঙাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আখের গোছাতে রাজ্যের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। তার জন্য যদি রাজ্যটাকে অপরাধমূলক কাজকর্মের স্বর্গরাজ্য বানাতে হয়, তাতেও তিনি দশ পা এগিয়ে। অতএব মাভৈঃ।**

ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেই রিপোর্ট বলছে— মহিলা নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের সেরা। শুধুমাত্র ২০১৬ সালেই মহিলাদের ওপর অ্যাসিড ছোঁড়ার ঘটনা ঘটেছে গোটা দেশে ২৮৩টি। আহত হয়েছেন ৩০৭ জন মহিলা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ঘটেছে ৭৬টি ঘটনা। আহতের সংখ্যা ৮৯। উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের দ্বিগুণ বড়ো রাজ্য। মহিলা জনসংখ্যাও অনেক বেশি। সেখানে কিন্তু একই অপরাধ ঘটেছে ৫৭টি। আহতের সংখ্যা ৬১। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারই গোটা দেশে রটিয়ে বেড়াচ্ছে, আদিত্যনাথ যোগীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে উত্তরপ্রদেশ নাকি অপরাধের নিরিখে দেশের সেরা।

স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে বধূ নির্যাতনের ঘটনা গোটা দেশে যখন ঘটেছে ১,১০,৪৩৪টি, পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে ১৯,৩০৫টি। অর্থাৎ মোট ঘটনার ১৭ শতাংশ ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গেই। রিপোর্টে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ হলো দেশের মধ্যে সব বড়ো নারী পাচার কেন্দ্র। ২০১৬ সালে গোটা দেশে ৮১৩২টি নারী পাচারের ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ঘটেছে সবচেয়ে বেশি ৩৫৭৯টি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো গোটা দেশে নারীসংক্রান্ত অপরাধের মোট ৪৩,৫১৩টি ঘটনার ৯.৬ শতাংশই ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। একটুর জন্যে ফার্স্ট হতে পারেনি। তবে দ্বিতীয়

স্থানটি আর কেউ কাড়তে পারেনি। উত্তরপ্রদেশ হয়েছে প্রথম। অপরাধীদের ধরা এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রথম উত্তরপ্রদেশ। শতাংশের হিসেবে ১৮.৯ শতাংশ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীরাই শাস্তি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে অনেকটাই। মাত্র ৩.৩ শতাংশ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীরা শাস্তি পেয়েছে এ রাজ্যে।

না, না, এখনই হতাশ হবে না। আরও অনেক বিষয় আছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গকে ধাক্কা দিতে পারে, এমন রাজ্য আর দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন ধরুন স্কুলছুটের সংখ্যা। কন্যাশ্রী আর সবুজ সাথী প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই ঢাক পেটান না কেন, জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে— এ রাজ্যে সাইকেল, ইউনিফর্ম, বই, জুতো, মিড ডে মিল বিনা পয়সায় পাবার পরেও আপার প্রাইমারি বিভাগে স্কুলছুট ছাত্রীর সংখ্যা ২.৯ শতাংশ। আর স্কুলছুট ছাত্রের সংখ্যা ৫.৮ শতাংশ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৮.৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে যাচ্ছে না। কারণ দারিদ্র্য। ছাত্রীরা বাড়িতে বাড়িতে বাসন মাজছে, ঘরদোর পরিষ্কার করছে। ছেলেরা যাচ্ছে কেরলে কিংবা ওমানে দিনমজুর ঘাটতে।

শিশুস্বাস্থ্য? খাদ্যপুষ্টি। আজ্ঞে হ্যাঁ। সেখানেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। গোটা দেশে অপুষ্টির শিকার যখন ৪৫.৯ শতাংশ শিশু, এ রাজ্যে তখনই অপুষ্টিতে ভুগছে ৪৩.৫ শতাংশ শিশু। এ হিসাব জার্নাল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ইনোভেশনের।

উচ্চশিক্ষা? না সেখানেও পিছনের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ সবার ওপরে। ২০১৬-র সি আই আই এবং ডিলয়েটের যৌথ রিপোর্টে বলা হয়েছে— রাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন প্রতিবছর কমছে। ২০১৫ সালে মোট ভর্তির অনুপাত (Gross Enrollment Ratio) ছিল ১৫ শতাংশ। ২০১৬-তে সেটা পৌঁছয় ১৭.৪ শতাংশে। ২০১৮-য় তা পৌঁছেছে ১৯ শতাংশে। এ ব্যাপারে সবার ওপরে থাকা চণ্ডীগড়কে ছুঁতে এ রাজ্যের এখনও ঢের বাকি। চণ্ডীগড়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সংখ্যার গড় ৫৬ শতাংশ। এর কারণ পশ্চিমবঙ্গকে উচ্চশিক্ষার জন্য অন্যতম পছন্দের রাজ্য বা Prezered choice হিসেবে দেশ বিদেশের ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষকরা একেবারেই গুরুত্ব দেন না। ফলে বিহার যখন উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির গড় সংখ্যা ২০৮১, ঝাড়খণ্ডে ২০২৫, ছত্তিগড়ে ১৭৪১, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ওই সংখ্যাটাই প্রতি বর্গকিমিতে ৮২৮ জন।

তার চেয়েও বড়ো আশঙ্কার খবর শুনিয়েছেন সমীক্ষকরা— তা হলো, এরাজ্যে বিদেশি জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মূলত বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর দৌলতে গত পাঁচ বছরে জনসংখ্যা ৯৩ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়ে গেছে প্রায় ৯৬ মিলিয়ন। এই জনসংখ্যার ৩২ শতাংশই মুসলমান যা ২০১১-তে ছিল ২৭.১ শতাংশ। সমীক্ষকরা জানাচ্ছেন, সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, পশ্চিমবঙ্গের বুকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় অপরাধ ঘটাচ্ছে বিদেশিরা, মূলত বাংলাদেশি মুসলমান জনগোষ্ঠী যারা বেআইনিভাবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে ব্যবহার করছে জালনোট পাচার, নারী পাচার, গোরু পাচার, হাওলার টাকা পাচার, অস্ত্রশস্ত্র পাচার ইত্যাদি অপরাধের সেফ জোন হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের মাটি আর গণতন্ত্রের মাটি নয়, প্রতিবাদ প্রতিরোধের দুর্জয় ঘাঁটি নয়। সংখ্যালঘু ভোটের কাঙাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আখের গোছাতে রাজ্যের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। তার জন্য যদি রাজ্যটাকে অপরাধমূলক কাজকর্মের স্বর্গরাজ্য বানাতে হয়, তাতেও তিনি দশ পা এগিয়ে। অতএব মাভৈঃ। ভোটবাজারে মুখ্যমন্ত্রীর গোয়েবলসীয় প্রচারে পশ্চিমবঙ্গ যতই ফার্স্টবয় হোক না কেন, বাস্তব ছবিটা হলো গত ৭ বছরে মুখ্যমন্ত্রীর আখের গোছানোর রাজনীতির জন্যই রাজ্য অনেকটা এগিয়েও আবার পিছিয়ে পড়েছে অনেকটাই। শেষ পর্যন্ত পিছন দিকে হেঁটে যাওয়ার প্রতিযোগিতাতেও যে পশ্চিমবঙ্গই ফার্স্ট হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখনও মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার পতাকা তুলে ধরে বলবেন--- আমরাই ফার্স্ট। গোটা ভারতবর্ষে গত আর্থিক বছরেও যেখানে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হয়েছিল ৩৪২.১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, উত্তরপ্রদেশে ভর্তি হয়েছিল ৬০.৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, মহারাষ্ট্রে ৩৭.৪ লক্ষ, তামিলনাড়ুতে ৩৩.৫ লক্ষ। তখন পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ। হ্যাঁ মাত্র ১৯ লক্ষ। তার মানে কি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পর ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছে? একাংশ তো দিচ্ছেই। কারণ দারিদ্র্য। কিন্তু বড়ো অংশটাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কোনো ভরসা রাখতে পারছে না। কারণ এরাজ্যে মাধ্যমিকের প্রশ্ন ফাঁস হয় প্রতিদিন। কারণ এরাজ্যে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি হয় ছাত্র সংসদকে টাকা দিয়ে। কারণ এরাজ্যে প্রতিদিন উপাচার্য, অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা তৃণমূল ছাত্রনেতাদের হাতে মার খান, লাঞ্ছিত হন। এ রাজ্যে অধিকাংশ কলেজে ক্লাস হয় না। কারণ প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক বা শিক্ষকদের ৭০ শতাংশ নিয়োগই অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কারণ রাজ্য সরকার মাইনে দিতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ হয়েছে সারবন্দি। পরিকাঠামো নেই। লাইব্রেরি নেই। ল্যাবরেটরি নেই। খেলার মাঠ নেই। খেলার সামগ্রী নেই। অতএব উচ্চশিক্ষার জন্য এরাজ্যের অন্তত ৬০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বেছে নিচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, পুনে, দিল্লি, চেন্নাই কিংবা অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা বা ইংল্যান্ডকে।

জনসংখ্যায়? না রাজ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় পরিমাপে প্রথম নয়। চতুর্থ। ২০১১ সালে এরাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৯১,২৭৬,১১৫। ২০১৮-য় তা হয়েছে ৯৭,৬৯৪,৯৬০। অর্থাৎ বৃদ্ধির মাত্রা এক দশকে ৬,৪১৮,৮৪৫। শতাংশের হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৭.০৩ শতাংশ। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। প্রথমত জনবসতির ঘনত্বে এরাজ্যই সবার ওপরে— ১০২৯ জন প্রতি বর্গকিমিতে। পশ্চিমবঙ্গ আরও অনেক কিছুতে ফার্স্ট। ভুল ইতিহাস বলায় ফার্স্ট। উৎসব শিল্পে ফার্স্ট। চোলাই মদে ফার্স্ট। স্বল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি বানানোয় ফার্স্ট। ছবি এঁকে দল চালানোয় ফার্স্ট। বই বেচে রাজ্য চালানোয় ফার্স্ট। সবচেয়ে বেশি নিস্কর্মা সাংসদ নির্বাচন করায় ফার্স্ট। মদ খেয়ে মরলে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ায় ফার্স্ট। ইমাম ভাতা দেওয়ায় ফার্স্ট। শিল্প ধরতে বিদেশ ঘোরায় ফার্স্ট। সবচেয়ে বেশি সেতু ভাঙায় ফার্স্ট। সেনাবাহিনীকে উস্কানি দেওয়ায় ফার্স্ট। সেজন্য একটা সেলাম হয়ে যাক মুখ্যমন্ত্রীকে। সে সেলাম কপালে আঙুল ছুঁইয়ে নয়। ভোটবাক্সে গেরুয়া শিবিরে আঙুল ছুঁইয়ে, সেটাই হবে সঠিক সেলাম। ■

শিশুসুলভ আচরণে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন রাহুল

রঞ্জন কুমার দে



২০১৪-র পর মোদী-শাহের জুটি অপ্রতিরোধ্য ছিল, দেশের প্রায় সবকটি রাজ্যে পদ্ম ফুটছিল। কংগ্রেসের পঞ্জাব জয়ের কৃতিত্ব পুরোটা ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহের ছিল, রাহুলের তেমন কোনও ভূমিকা ছিল না। তিন রাজ্যে কংগ্রেসের বিজয় সম্পূর্ণ বিজেপির প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছিল এবং ছত্তিশগড় ছাড়া মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কংগ্রেসের ভোটের ব্যবধান খুব নগণ্য ছিল। যাই হোক খোদ মোদীজীর গড়ে গুজরাট বিধানসভায় কংগ্রেস পরাস্ত হলেও রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতীয় পর্যায়ে খুব বাহাবা কুঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সীমিত যা বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিচয় দিয়েছেন। তাই কংগ্রেস বাধ্য হয়ে বোন প্রিয়াঙ্কাকে উত্তরপ্রদেশের কামান কাঁধে নিতে হয়। পুলওয়ামা হিংসায় মোদী যখন পাকিস্তানকে একের পর এক মোক্ষম জবাব দিচ্ছিলেন রাহুল এবং কংগ্রেসের ভূমিকা তখন হাস্যকর ছিল। প্রধানমন্ত্রী এবং সেনার পরাক্রমের উপর রাহুল গান্ধীর সন্দেহ পাকিস্তানের মিথ্যা দাবিগুলোকে আরও পোক্ত করছিল। রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস হয়তো ইতিমধ্যে ভুলে গেছে ১৯৭১-এ যখন ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে দু' টুকরো করেছিলেন বিরোধী দল এবং সব দলনেতা তখন মহান সংসদে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। রাহুল গান্ধী সেই বিচক্ষণতা দেখাতে পারেননি। তাই রাহুল গান্ধী এবং বিরোধী ব্রিগেডের নেতিবাচক কার্যকলাপকে মোদী সহজে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করতে পারছেন।

কাশ্মীরে এমনিতেই টানটান উত্তেজনা চলছে, এই সুযোগে রাহুল নিজেদের ছবি আরও স্বচ্ছ করতে পারতেন, কিন্তু কংগ্রেস যে লোকসভার ইস্তেহার প্রকাশ করেছে তাতে পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের দাবিগুলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তাদের ইস্তেহারে অন্যতম ইস্যুগুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে দেশদ্রোহ আইন অর্থাৎ ১২৪ (এ) বাতিল করা, কাশ্মীর থেকে আফস্পা বাতিল ও সেনা শিথিলকরণ, সন্ত্রাসবাদী ও হুরিয়ত নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা, কাশ্মীরের ৩৭০ এবং ৩৫ (এ)-কে আরও শক্তিশালী করা, রাফাল চুক্তি বাতিলকরণ ইত্যাদি। কংগ্রেসের এই ইস্তেহারে মেহবুবা, ফারুক আব্দুল্লারা অনেক খুশি, উপত্যকায় হয়তো কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কও কিছুটা পোক্ত হবে কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো দেশে গেরুয়া ব্রিগেড কংগ্রেসকে দেশদ্রোহী হিসাবে উপস্থাপনা করার সুযোগ পেয়েছে। এটা রাহুল গান্ধীর অপরিপক্কতা ছিল না কি! কিন্তু মোদী-শাহ বিজেপির ইস্তেহারে কাশ্মীর ইস্যুকে অত্যন্ত বিচক্ষণতায় উপস্থাপন করে বিজেপিকে একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে কাশ্মীরে ধারা ৩৭০ এবং ৩৫ (এ)-র বিলুপ্তি, সন্ত্রাসবাদে আপোশহীনতা, সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ, কাশ্মীরি হিন্দুদের প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি দেশহিতের ইস্যু স্থান পেয়েছে। স্বভাবতই এরকম ইস্তেহারে মুফতি-ফারুকের গাত্র দহন হচ্ছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভোটব্যাক্সে বিজেপি লাভবান হচ্ছে। কারণ কাশ্মীরের তিনটি লোকসভা আসন বিজেপির হাতছাড়া হলেও জম্মুতে তিনটি আসন তাদের পোক্ত হচ্ছে, তৎসঙ্গে বিজেপির জাতীয়তাবাদী চেহারা পুরো দেশের নির্বাচনে প্রভাব ফেলছে।

দেশের এই জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থী স্বতন্ত্র, স্বাভাবিকভাবে যেকোনো আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই পারেন। সেই অনুসারে রাহুল গান্ধী এবার আমেথির সঙ্গে

> **“সর্বোচ্চ আদালতে রাহুল গান্ধীকে দু-দুবার ক্ষমা চাইতে হয়েছে। রাহুল দেশের সবচেয়ে পুরনো দলের অধ্যক্ষ কিন্তু তাঁর শিশুসুলভ আচরণ এবং সিদ্ধান্তে কংগ্রেস দেশের জনগণের মধ্যে ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে।”**

কেরলের ওয়ানাড আসন থেকে লড়ছেন। যেকোনো প্রার্থী একটি, দুটি কিংবা তিনটা আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, সেখানে অনেকগুলো কারণ কাজ করে। যেমন দলের শক্তিশালী প্রার্থী কোন কেন্দ্র থেকে লড়লে আশেপাশের এলাকাগুলো প্রভাবিত হয়, প্রার্থীর রিস্ক ফ্যাক্টর কমে যায় অর্থাৎ একটিতে হারলেও অন্যটিতে সম্ভাবনা থাকে ইত্যাদি। রাহুল গান্ধীর ক্ষেত্রে আমেথির জেলা কংগ্রেস তাঁকে সতর্ক করে দেয় যে এলাকার জমি এবার কংগ্রেসের জন্য তেমন উর্বর নয়। বলতে গেলে আমেথি, রায়বেরেলি কংগ্রেসের পারিবারিক আসন, সেই সুবাদে মায়া- অখিলেশের গঠবন্ধন কংগ্রেসিদের দুটি আসন ছেড়ে দিয়েছিল। দিল্লি জয় করতে রাজনৈতিক মহারথীরা উত্তরপ্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনকে লক্ষ্য রেখে সেখানে নিজের ভাগ্য পরখ করতে আসেন। রাহুল আমেথিতে ২০০৪ থেকে অনবরত ৩ বারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য। এর আগেও মা সোনিয়া গান্ধীর রণভূমি ছিল আমেথি। বিজেপি ১৯৯৮-এর পর সেখানে আর জিততে পারেনি। এরপরেও রাহুল গান্ধীর অন্য রাজ্য প্রস্থানের কারণ স্মৃতি ইরানির রণহুংকার নয়, স্মৃতি ২০১৪-র লোকসভায় রাহুলের কাছে মাত্র এক লাখ সাত হাজার ভোটে পরাজিত হন, সেখানে ২০০৯-এ রাহুল গান্ধী ৩ লাখ সত্তর হাজার উপর ভোটে জয়ী হয়েছিল।

সুতরাং স্মৃতির এই হারকে বিজেপি নেতৃত্ব নৈতিক জয় হিসাবে মেনে নিয়েছিল। সম্ভবত সেই কারণে আমেথিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ সব সময় স্মৃতি ইরানির সমর্থনে জনসংযোগ করেছিলেন। স্মৃতি ইরানির রাজনৈতিক জমি পোক্ত করতে শুধু এই লোকসভা অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় ৫৩৮ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। অতীতে কংগ্রেসের বিভিন্ন দুঃসময়ে ইন্দিরা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী পৃথক পৃথক আসন থেকে নির্বাচনে লড়ছিলেন কিন্তু কাউকে কেরলে যেতে হয়নি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যুক্তি ওয়ানাড কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর মধ্যবর্তী এলাকা, ফলে তিন রাজ্যের ভোটাররা যথেষ্ট প্রভাবিত হবেন এবং ওয়ানাডের স্থানীয় নেতৃত্বের চাহিদাও রাহুলের প্রতি। কিন্তু যুক্তিগুলো খুব একটা সঙ্গত নয়, কেননা কর্ণাটকে এমনিতেই কংগ্রেস-জেডিএসের জোট সরকার চলছে, তামিলনাড়ুর স্টালিনদের সঙ্গে রাহুলের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া কেরলের ওয়ানাডে ছোটো গান্ধীর নির্বাচনে লড়া মানে বামদের সঙ্গে ঝামেলা পাকানো যারা কিনা মোদী বিরোধী জোটে রাহুল গান্ধীর সঙ্গ দিয়ে আসছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৪-এর জাতীয় নির্বাচনে কংগ্রেস ওয়ানাডে মাত্র ২০,০০০ ভোটে জয়ী হয়েছিল, যেটা খুবই দুর্বল প্রার্থক্য। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে কংগ্রেসের যুবরাজকে এমন ঝুঁকিপূর্ণ রণভূমিতে পাঠানোর উদ্দেশ্য কী! ওয়ানাড লোকসভা কেন্দ্রে ৪৯% মুসলমান, ৪৯% হিন্দু, বাকিরা খ্রিস্টান। মানা যাচ্ছে সংখ্যালঘু ভোটে অধিক বিশ্বস্ততা এবং পুরো দেশে ধর্ম নিরেপক্ষতার ছবি আরও স্পষ্ট করা কংগ্রেসের ওয়ানাডের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গত লোকসভা নির্বাচনে হারের পর কংগ্রেসের এন্ট্রোনি কমিটির এক রিপোর্টে বলা হয় কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের পার্টি হওয়ার তকমায় ভোটে বিপর্যয় ঘটেছিল। তারপর আমরা অবশ্যই দেখেছি সোমনাথ মন্দির সহ একাধিক মন্দিরে রাহুল গান্ধীর বিচরণ, পৈতাধারী ব্রাহ্মণ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করা ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে দলের সংখ্যালঘু নেতাদের কাছে কিছুটা অপ্রিয় হলেও হিন্দি ও হিন্দু অধ্যুষিত রাজ্যে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক যথেষ্ট ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। তাহলে ওয়ানাডে দাঁড়ানো কি এই সমস্ত হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রভাব ফেলবে না! ওয়ানাডে রাহুল গান্ধীর মনোয়ন দাখিল মোটেই সুখকর হয়নি। নিঃসন্দেহে অনুষ্ঠানটিতে অনেক জনসমাবেশ হয়েছিল সত্যি, কিন্তু ভিড়ে কংগ্রেসের তেরঙা চাঁদ-তারা পতাকায় পাকিস্তানের সবুজ রাষ্ট্র পতাকার ন্যায় তারা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল পাকিস্তানের করাচিতে কোনও রোড শো চলছে। কিন্তু বাস্তবে এটা পাকিস্তানের পতাকা ছিল না। পতাকাটি কংগ্রেসের সহযেগী দল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের দলীয় পতাকা ছিল। এই ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের সঙ্গে পাকিস্তানের মহম্মদ আলি জিন্নার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৪৭ সালের আগে পুরো দেশে জিন্নার অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ পার্টি ছিল। ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের পরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ দলের সব নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় যে পাকিস্তান নির্মাণ করা দলটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং দলটির উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাওয়াতে বৈঠকটিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বিষবৃক্ষে ফল ধরতে শুরু করে। পরবর্তীতে পাকিস্তানে দলটির নতুন নামকরণ হয় মুসলিম লিগ, বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ এবং ভারতে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ। ওরাই আজ কেরলে রাহুলদের জোটসঙ্গী। জিন্নার সবুজ পতাকায় চাঁদ-তারা, মাধখানে আর ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের সবুজ পতাকায় চাঁদ-তারা এককোণে। রাহুল গান্ধীর কী এমন বাধ্যবাধকতা ছিল জিন্নার আদর্শিত কেরলের এই মুসলিম লিগের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচনে লড়ার; এটা তাঁর অপরিপক্ক বুদ্ধি নয়তো আর কী!

রাহুল গান্ধী প্রত্যেকটি জনসভায় 'চৌকিদার চোর হ্যায়' চিৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি খারাপ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর 'ম্যায় ভি চৌকিদার' উলটা জবাবে বিরোধীরা অনেক আগেই কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাহুল সম্প্রতি সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন সুপ্রিম কোর্টও মেনে নিয়েছে নাকি চৌকিদার চোর। রাহুলের এই মিথ্যা বয়ানের সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টীকরণ চায়, রাহুল জবাবে জানান এটা নাকি তিনি আবেগের বশীভূত হয়ে বলেছিলেন। সর্বোচ্চ আদালতে তাঁকে দু-দুবার ক্ষমা চাইতে হয়েছে। রাহুল দেশের সবচেয়ে পুরনো দলের অধ্যক্ষ কিন্তু তাঁর শিশুসুলভ আচরণ এবং সিদ্ধান্তে কংগ্রেস দেশের জনগণের মধ্যে ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। ▮

কথাঞ্জলি ও চোখে আঙুল দাদার সওয়াল জবাব

সৃজিত রায়

কংগ্রেস নেতা অরুণাভ ঘোষ সম্প্রতি দুটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

১। দিদির মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেওয়া বক্তৃতাগুলো শুনলে মনে হয় সকালে কলতলায় মহিলাদের ঝগড়া হচ্ছে।

২। দিদির যে কোনো নির্বাচনী বক্তৃতা ভালো হাসির বই হতে পারে।

আমরা এসব কিছু বলছি না। শুধু দিদির কিছু বক্তব্য 'কথাঞ্জলি' হিসেবে তুলে ধরছি। আর তুলে ধরছি ওই কথাঞ্জলি প্রসঙ্গে চোখে আঙুল দাদার সওয়াল জবাব।

কথাঞ্জলি-১

''বারাণসীতে আমি ভোটে দাঁড়ালে মোদী একটাও ভোট পাবে না। আমি দাঁড়ালে জনগণ মোদীকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মোদীকে আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করলাম।''

চোখে আঙুল দাদা : দিদি কিন্তু বারাণসী গিয়ে প্রার্থীপদ জমা দেননি। কী অসাধারণ 'ওপেন চ্যালেঞ্জ'! ঘর ঘর মোদী, হেরো হেরো দিদি।

কথাঞ্জলি-২

(সভামঞ্চে হঠাৎ এক হনুমানের আবির্ভাব দেখে) এটা কে? কোত্থেকে এল? কী মিষ্টি! আমি ওদের খুব ভালোবাসি। পশুপাখিদের ভালোবাসি। ওদের খাবার দিই। ওকে কেউ ডিসটার্ব করবেন না। ওকে বসে থাকতে দিন।

চোখে আঙুল দাদা : হেঃ হেঃ! দিদি এবার হনুমান চালিশা পড়বেন। হনুমান গড়িতে পুজো দেবেন।

কথাঞ্জলি-৩

''মোদী স্বৈরতান্ত্রিক। মোদী মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন। মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করে রাখেন। আমরা মিডিয়াকে কণ্ঠরোধ করে রাখি না। আমাদের রাজ্যে মিডিয়া স্বাধীন। ভারতবর্ষের আর কোথাও মিডিয়া এত স্বাধীন নয়।''

চোখে আঙুল দাদা : ও! সেজন্যেই বুঝি বাংলা সংবাদমাধ্যমগুলো শুধু সরকার ও শাসকদলের খবর ছাপে। বাকি খবর সব চাপে। তা বেশ! বেশ!

কথাঞ্জলি-৪

(নির্বাচনী সভায় একটি বাচ্চা হারিয়ে



যাওয়ায় শোরগোল উঠলে) ''বাচ্চা হারিয়েছে তো কী হয়েছে। বাচ্চা ঠিক পাওয়া যাবে। এখন আগে মিটিংটা ঠিকঠাক চলুক।''

চোখে আঙুল দাদা : ঠিকই তো! সামনে ভোট বলে কথা! আচ্ছা তোমার চোখের পাতা নেই নাকি দিদিমণি?

কথাঞ্জলি-৫

''আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমি ওসব চোখরাঙানিতে ভয় পাই না। কত ভয় দেখাবে? কতদিন ভয় দেখাবে? বলি মোদী, তুমি গোটা দেশের লোককে ভয় দেখাতে পারবে?''

চোখে আঙুল দাদা : আরে ধুর! দিদি আপনি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৪ শতাংশ আসনে বিরোধীদের লড়তেই দেননি। আপনি কেন ভয় পাবেন মোদীকে? ছোঃ!

কথাঞ্জলি-৬

''মোদীকে নিয়ে নাকি সিনেমা বেরোবে। ভোটের আগে যত ধান্দাবাজি! বলি, তোমার সিনেমা লোকে দেখবে কেন? যদি দেখতেই হয় তো গান্ধীজীকে নিয়ে তৈরি সিনেমা দেখবে। না হয় আম্বেদকরকে নিয়ে তৈরি সিনেমা দেখবে। মোদীকে নিয়ে দেখবে কেন? কে হে তুমি। চা-ওয়ালা ছিলে। এখন চৌকিদার সেজে মানুষকে ভড়কি দিচ্ছ। ভারতবর্ষের জন্য কী করেছ তুমি?''

চোখে আঙুল দাদা : আহা রে! ওই কথার তোড়ে দিদি তোমার নামে তৈরি সিনেমা 'বাঘিনী'টাও মাঠে মারা গেল!

কথাঞ্জলি-৭

''মোদীকে আমি প্রধানমন্ত্রী বলি না। উনি এখন এক্সপায়ারি বাবু। ওনার সরকারের এক্সপায়ারি ডেট শেষ হয়ে গেছে।''

চোখে আঙুল দাদা : ও দিদি। সংবিধান তো ঘেঁটে ফেললাম। এরকম কিছু পেলাম না তো!

কথাঞ্জলি-৮

''ওরা নাকি হিন্দু। ওরা নাকি পণ্ডিত। একটা মন্ত্রও বলতে পারে আমার মতো। বলুক দেখি আমার মতো— ওঁ জবা কুসুমং... আপনারা কখনও পুজো করেন? শুধু একটা সিঁদুরের তিলক কাটলেই পুজো হয় না। পুজোর মন্ত্রের কম্পিটিশন ডাক। অমিতবাবু এবং মোদীবাবু, চলে আসুন আমার সঙ্গে। কে কত সংস্কৃত মন্ত্র জানেন, আমি দেখাচ্ছি।''

চোখে আঙুল দাদা : ওরি ব্বাস! রাজনীতিতে এলেন কেন? মহিলা পুরুত হয়ে যান দিদি। কেউ হারাতে পারবে না!

কথাঞ্জলি-৯

''প্রধানমন্ত্রীকে দেখে কেউ ভয় পায়? মোদীকে দেখলেই ভয় হয়। যেমন বাজখাই গলা, তেমনি ভাবভঙ্গি। চোখগুলো দেখেছেন? যেন ভস্ম করে দেবে। প্রধানমন্ত্রী তো নয়, যেন গব্বর সিংহ।''

চোখে আঙুল দাদা : দিদি, এই তো সবে শুরু। খেল আভি বাকি হ্যায়। এখনই ভয় পেয়ে গেলে চলবে?

কথাঞ্জলি-১০

''আজ হিন্দু-মুসলমানে গোলমাল লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে, এরপরে বাঙ্গালি-মাড়োয়ারির মধ্যে গোলমাল লাগানো হবে। আমার সরকার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, দীনেশ বাজাজ, সঞ্জয় বুধিয়ার মতো শিল্পপতিদের সম্মান দিয়েছে। আমি

বিদেশে গেলে এঁদের সঙ্গে নিয়ে যাই। এখন যা পরিস্থিতি, এর পরিবর্তন হওয়া জরুরি। এই পরিবর্তন হলে, আপনাদের মতো ব্যবসায়ীদের কোনো সমস্যা হবে না। ইন্ডাস্ট্রির কোনও ক্ষতি হবে না। মাড়োয়ারি সমাজ, গুজরাটি সমাজ, পঞ্জাবি সমাজ— সব আমাদেরই সমাজ। আপনাদের ওপর কোনো অত্যাচার হতে দেব না।"

চোখে আঙুল দাদা : হেব্বি জাত ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাষণ দিয়েছেন মাইরি! এরকম আর দু-চারটে দিন! খেলা শেষ!

কথাঞ্জলি-১১

"মোদী নিদের প্রচার ছাড়া কিছুই করেন না। তিনি হচ্ছেন সব ফ্যাসিবাদী শাসকদের রাজা। দাঙ্গা ও গণহত্যার চর্চাই করেন তিনি। আজ যদি হিটলার বেঁচে থাকতেন তাহলে মোদীর কাজকর্ম দেখে আত্মহত্যা করতেন।"

চোখে আঙুল দাদা : হিটলার তো আত্মহত্যাই করেছিলেন। ইতিহাসে তো তাই পড়েছি দিদি! সেটা কি ভুল ছিল?

কথাঞ্জলি-১২

"বিজেপি এবার উঠে দাঁড়তে পারবে না। বাঙ্গলায় তো শূন্য পাবেই। খাতা খুলতে পারবে না তামিলনাড়ু, কেরলে, ওড়িশাতেও। হারবে বিহারে, ঝাড়খণ্ডে। উত্তরপ্রদেশে হারবে শোচনীয় ভাবে। গোহারা হারবে রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশেও। তাহলে জিতবে কোথায়?"

চোখে আঙুল দাদা : তাহলে! গোটা দেশটা জুড়ে থাকবে শুধু ঘাস আর ঘাসফুল। চাষও হবে না। বাসও হবে না। কেয়া বাত্!

কথাঞ্জলি-১৩

(দলত্যাগী মুকল রায় ও অর্জুন সিংহকে লক্ষ্য করে)

"কেউ কেউ এমনও হয় যে যতই দাও, তাও সাধ মেটে না। এই জেলাতেই (উত্তর ২৪ পরগনা) এরকম দুজন আছে। একজন বড়ো, আর একজন ছোটো। ওদের এমপি করতে হবে। এম এল এ করতে হবে, দোকান দিতে হবে, হোটেল দিতে হবে, মল দিতে হবে, পাব দিতে হবে, গার্ডেন দিতে হবে, বাজার দিতে হবে। সব চাই ওদের। নিজে না খেয়ে ওদের খাইয়েছি। দিতে দিতে খালি হয়ে গেছি।"

চোখে আঙুল দাদা : একেই বলে চোরের ওপর বাটপাড়ি! সব দুজনে খেল। দিদি, তোমার ভাগে ফক্কা!

কথাঞ্জলি-১৪

"আমাদের (তৃণমূল কংগ্রেসের) ব্লক সভাপতির যে যোগ্যতা আছে, সেই যোগ্যতা অমিত শাহের নেই। চ্যালেঞ্জ করে বলছি। একজন জেলা সভাপতির যে যোগ্যতা আছে, তা নরেন্দ্র মোদীর নেই।"

চোখে আঙুল দাদা : আই বাপ! কী কথা বললে গো দিদি। তা উনাদের দলে নিয়ে ট্রেনিংটা দিয়া দ্যান! দেখে লিবেন—কত ধানে কত চাল!

কথাঞ্জলি-১৫

"একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে এম এল এ, এম পি বেচাকেনা করছে। লজ্জা করে না! নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী। মনে রাখবেন— আমার একটা গেলে ১ লাখ তৈরি হয়ে যায়।"

চোখে আঙুল দাদা : এ তো সেই রাক্ষুসির রক্তবীজের গপ্পো শোনালে গো দিদি। সর্বনাশ!

কথাঞ্জলি-১৬

"৪২-এ ৪২ দিন। দিল্লি কাঁপিয়ে সরকার গঠন করবে তৃণমূল।"

চোখে আঙুল দাদা : তা তুমি পার দিদি। আট বছরে পশ্চিমবঙ্গ যা কাঁপানো কাঁপালে যে এবার তোমার গদিই টলমল।

কথাঞ্জলি-১৭

"আমি আগেও বলেছি, বাংলা গদির জন্য লালায়িত নয়। বাঙ্গলা পদ চায় না। তবে জনগণের পক্ষে একটা সরকার গড়ার জন্য বাংলা তার দায়িত্ব অবশ্যই পালন করবে।"

চোখে আঙুল দাদা : দিদি কিন্তু বলেননি, তিনি পদ চান না! হেঃ! হেঃ!

কথাঞ্জলি-১৮

"তাঁর (রাম) নাম বারবার করায় স্বয়ং ভগবান রামও বোধহয় বিরক্ত।...রামবাবুকে এজেন্ট করে ভোটভিক্ষা করতে নেমেছে। ওদের (বিজেপির) এ টু জেড, সবাই।"

চোখে আঙুল দাদা : আহা! রামচন্দ্রের প্রতি দিদির কত শ্রদ্ধা! বলছে, রামবাবু নাকি বিজেপির এজেন্ট। হায়! হায়!

কথাঞ্জলি-১৯

"যতদিন বাঁচব, মানুষের জন্য কাজ করে যাব। যেদিন মানুষ চাইবে না, তাড়াতে হবে না, নিজেই চলে যাব।"

চোখে আঙুল দাদা : হঠাৎ তাড়ানোর প্রশ্ন কেন? ভয় পেয়েছেন নাকি? সবে তো কলির সন্ধ্যে গো!

কথাঞ্জলি-২০

(চন্দ্রকোনা টাউনের রাধাবল্লভপুরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া)

"এদের (গ্রামবাসীদের) কোনও সৌজন্য নেই। একটা দলের প্রচার শুনে এসব করে। বেশি গরম দেখাবেন না। আমি আমার কর্মীদের বলে দিলে কী হবে। ভেবে দেখবেন।"

চোখে আঙুল দাদা : এতো অবিকল আপনার দলের সাংসদ তাপস পালের কণ্ঠস্বর! উনি বলেছিলেন, ঘরে ঘরে তৃণমূল কর্মীদের ঢুকিয়ে মেয়েদের রেপ করাবেন। দিদি আপনিও!

কথাঞ্জলি-২১

(ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের উদ্দেশে)

"আপনি আমার মুখটা খোলাবেন না। আপনি যে এস এম এসগুলো পুলিশে কাজ করার সময় আমায় করেছিলেন, সেগুলো যদি আমি এখন পাবলিক করে দিই, তাহলে আমাকে আর মানুষকে কিছু বলতে হবে। মানুষই সব বুঝে নেবে।"

চোখে আঙুল দাদা : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমরা বুঝে নিতে চাই। সব চেপে রেখেছেন কেন? ফাঁস করে দিচ্ছেন না কেন? কার ভয়ে? পর্দা কে পিছে কেয়া হ্যায়? ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

‘জয় শ্রীরাম’ গালাগালি হলে আরশোলাও পাখি

রাজ্য রাজনীতি

সন্দীপ চক্রবর্তী

এই নিবন্ধের শিরোনাম দেখে বিস্মিত হবেন না। আরশোলার মতো নিরীহ প্রাণীকে রাজনৈতিক কূটকচালির মধ্যে টেনে আনার ইচ্ছে নিবন্ধ লেখকের একেবারেই ছিল না কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাণ্ডকারখানা দেখে নিরুপায় হয়ে আনতে হলো।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি দাবি করেছেন জয় শ্রীরাম একটি গালাগালি বিশেষ। যদি কেউ জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেয় তাহলে তার মনে হয় তাকে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে। চন্দ্রকোণার রাধাগোবিন্দপুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই দাবি। ঘটনাটি এইরকম। ফণী বিদায় নেবার পর মমতা যখন কলকাতায় ফিরছিলেন, সেই সময় কিছু গ্রামবাসী জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেয়। ক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত মমতা গাড়ি থেকে নেমে তাদের পিছু ধাওয়া করেন। তাকে বলতে শোনা যায়, ‘পালাচ্ছিস কেন? আয় আয়। হরিদাস সব। গালাগালি শিখেছে।’ ‘মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে (!) সায়ন মিদ্দা, সীতারাম মিদ্দা এবং বুদ্ধদেব দলুইকে গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।



জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজন।

এখন প্রশ্ন হলো, জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে মমতা রেগে গেলেন কেন? কেনই বা এই ধ্বনিকে গালাগালির তকমা দিলেন? প্রথমেই বলে রাখা ভালো এইসব প্রশ্নের এক কথায় কোনও উত্তর হয় না। চাইলে মমতা ঘটনাটিকে উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এমনকী, রাগের মাথায় হঠাৎ কিছু করে ফেলা বলতে আমরা যা বুঝি, তাও তিনি করেননি। তিনি যা করেছেন সেটি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা একটি প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট অংশ। প্রক্রিয়াটিকে আমরা ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে সাম্প্রদায়িকতা বলতে পারি, আবার সরাসরি সাম্প্রদায়িকতাও বলতে পারি। এই নিবন্ধ যখন লিখছি তখনও লোকসভা নির্বাচনের শেষ দুটি পর্যায়ের ভোটগ্রহণ বাকি। মমতার এই জয় শ্রীরাম-ইস্যুর লক্ষ্য ছিল ভোট। বিশেষ করে মুসলমান ভোট। এখনও যেসব জেলায় ভোট বাকি, সব জায়গাতেই মুসলমানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু মমতার সমস্যা হলো এবার মুসলমান ভোট মোট চারভাগে ভাগ হবে। কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। ২০১১-র বিধানসভা, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে এই সমস্যা ছিল না। ২০১১ সালে তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোট করেছিল। সেবার সিপিএম মুসলমান ভোট পায়নি বললেই চলে। বিজেপির ভূমিকাও ছিল নগণ্য। ২০১৪ সালে সারা দেশে মোদী ঝড় চললেও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর তেমন প্রভাব পড়েনি। সারাদা কাণ্ডের ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেলেও, সেবার মমতা নরেন্দ্র মোদীকে ‘দাঙ্গাবাজ’ ইত্যাদি বলে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা প্রথম মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে ধস নামার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সেবার সিপিএম আর কংগ্রেস তৃমমূলের বিরুদ্ধে জোট করেছিল। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আসনে পর্যুদস্ত হয়েছিল তৃণমূল। বস্তুত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আত্মবিশ্বাসী চেহারা আমরা দেখে অভ্যস্ত, দক্ষিণবঙ্গে ভোট গণনা শুরু হবার আগে পর্যন্ত দেখা যায়নি। এবারে সেই মুসলমান ভোট চার ভাগে ভাগ হবে। তাই তিনি অনন্ত চাপের মধ্যে আছেন। সেই কারণেই জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে গালাগালির তকমা দিয়ে তিনি মুসলমানদের বার্তা দিয়েছেন। তার বার্তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হেঁয়ালি নেই। তিনি বলতে চান, যে কথা মুসলমান নেতারাও বলতে সাহস পান না, সে কথা তিনি অনায়াসে বলতে পারেন। জয় শ্রীরাম ধ্বনির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারেন, সারা দেশে পূজিত মর্যাদা পুরুষোত্তম

শ্রীরামচন্দ্রের দেবত্বকে অস্বীকার করতে পারেন। তাঁর মতো মুসলমান- দরদি, ইসলাম-হিতৈষী নেতা আর কেউ নেই। সুতরাং মুসলমানদের ভোট যেন তৃণমূল পায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রামকে তিনি দেবতা মানেন না। ঠিকই বলেছেন। তবে দেবতা কথাটির অর্থ না বুঝে বলেছেন। দেবতা আর ঈশ্বর এক জিনিস নয় দিদি। দেবত্ব গুণবিশেষ। যে ব্যক্তি এই গুণের অধিকারী তিনিই দেবতা। এর সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। আপনার ফিরহাদ হাকিম যদি এই দেবগুণের অধিকারী হন তা হলে তিনি দেবতা হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। আপনি রামকে দেবতা মানেন না তার অর্থ কি আপনি রামের দেবসুলভ গুণাবলী মানেন না? নাকি রামকে ঈশ্বর মানেন না? এই জায়গাটা কিন্তু স্পষ্ট হলো না।

আরও একটা জট আপনি ইচ্ছে করে খোলেননি। রাম যদি দেবতা না হন তাহলে তিনি অবশ্যই মানুষ। রক্তমাংসের মানুষ। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ তার জন্মস্থান আছে, কর্মভূমি আছে, এমনকী যে সেতু পেরিয়ে তিনি লঙ্কায় গিয়েছিলেন, তারও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মানুষ হলে তিনি কেমন মানুষ! তিনি কি বাল্মীকি-সৃষ্ট কোনও কাল্পনিক মানবচরিত্র নাকি এমন একজন মানুষ যার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর আপনি দেননি। বলা বাহুল্য, দেবেনও না। শুধু আপনি কেন, সারা দেশে ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের মধ্যে কারোও এমন সাহস নেই যে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কারণ সারা পৃথিবীতে আজ অবধি এমন কোনও কবি জন্মাননি যার সৃষ্ট কোনও চরিত্র হাজার হাজার বছর ধরে জনমানসকে উদ্বেল করে তুলতে পারে। যে কাল্পনিক চরিত্রের আবির্ভাব তিথি পালন করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামে। যার যুদ্ধজয়ের এবং ঘরে ফেরার আনন্দে মানুষ উৎসব করে, বাজি পোড়ায়। কোনও কাল্পনিক চরিত্রের পক্ষেই এতদিন ধরে জনমানসে ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ স্থান-কাল-পাত্রের নিগড়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে সম্ভব নয়। তা সে নিজের সময়ে যতই নন্দিত এবং বন্দিত হোক না কেন! সংস্কৃত ভাষা যতদিন দেশের অগ্রগণ্য ভাষা ছিল ততদিন কবি কালিদাস-সৃষ্ট অমর চরিত্র দুষ্মন্ত শকুন্তলা মানুষের মনে উজ্জ্বল হয়েছিলেন। এখন আর নেই। জাতকের কাহিনিতে বর্ণিত চরিত্রগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যতদিন ভারতবর্ষের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, ততদিন চরিত্রগুলি ছিল অমর। এখন আর নয়। রামায়ণও সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সুতরাং কালের ধর্ম মেনেই কাল্পনিক রামচরিত্রের মুছে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাম মুছে যাননি। কারণ তিনি কাল্পনিক চরিত্র নন, ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু মমতা রামকে মানুষ বলেই খালাস। তার ঐতিহাসিকতা মানতে রাজি নন। রামকে ঐতিহাসিক চরিত্র মানলে প্রাচীন যুগ থেকে প্রবহমান ভারতীয় অস্মিতার কথাও মানতে হয়। রাম ভারতীয় অস্মিতারই প্রতীক। তিনিই ভারতকে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সার্বভৌম ভারত রূপলাভ করেছিল তাঁর হাতে। এখানেই মমতা-সহ ভারতের সব ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামপন্থী নেতাদের আপত্তি। তাদের লড়াই অখণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে। তাদের রাজনীতি ভারতকে ভাঙার রাজনীতি। সেই কারণেই রামের প্রতি মমতার এই সীমাহীন অশ্রদ্ধা।

মমতার কাছে জয় শ্রীরাম ধ্বনি গালাগালি পদবাচ্য। মমতার মুখে তার এই অশিষ্টাচারের কথা শোনার পর চমকে উঠেছে বাঙ্গালি। নিন্দা আর কটূক্তির ঝড় বয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকেই তাঁকে অসভ্য, 'নাস্তিক' 'পাগল' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কিন্তু সবিনয়ে বলি তিনি এর কোনওটাই নন। তিনি শঠ, ধূর্ত এবং অসম্ভব স্বার্থপর। রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে নিষিদ্ধ পশুর মাংস রাখতেও পিছপা হন না। তিনি জানেন, ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস ওঝা তুলসীদাসেরও আগে রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন। বহু বাঙ্গালি পরিবারে আজও সযত্নে পঠিত হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বহু বাঙ্গালি পরিবারে পূজিত হন রাম। হ্যাঁ, দেবতা হিসেবেই। এদেশের মানুষের মন সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই লিখেছিলেন, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।' এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে তাদের প্রিয় মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছেন দেবতা। এ ভাবেই মানুষ থেকে দেবতা হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, মা-সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী এবং গান্ধীজী। এরা কেউই ঈশ্বর নন, শুধুই দেবতা। মানুষ এদের কাছে ঋণী বলেই এরা দেবতা। ভারতীয়দের কাছে এদের স্মরণ-মনন সেই ঋণ স্বীকারের প্রক্রিয়া বিশেষ। রামের কাছেও ভারত ঋণী। তাই রামও দেবতা। 'জয় শ্রীরাম' ছিল রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বানরসেনার রণহুংকার। পরে জয় শ্রীরাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও সংগ্রামে সাধারণ ভারতীয়দের রণহুংকার হয়ে দাঁড়ায়। আজ এই ধ্বনি বন্দে মাতরমের সমগোত্রীয়। সুতরাং জয় শ্রীরাম যদি গালাগালি হয় তাহলে আরশোলাও তো পাখি।

সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কথা বলেন। বলুন আপত্তি নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তিনি বন্ধ করতে পারবেন না। মা দুর্গার অকালবোধন বাঙ্গালির বড়ো প্রিয়। বাঙ্গালি জানে শরৎকালে মা দুর্গার অকালবোধন কার জন্য হয়েছিল। কে করেছিলেন, কেনই বা করেছিলেন? দুর্গার পরমভক্তের নামে অকথা-কুকথা বললে বাঙ্গালি ছেড়ে কথা বলবে না। মমতাও সেটা জানেন। তাই তিনি শুধু গর্জাবেন, বর্ষানোর সাহস তার কোনোদিনই হবে না। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

জয়শ্রীরাম ধ্বনি এবং ধর্মনিরপেক্ষ মুখ্যমন্ত্রী

শেষমেশ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের জাত নিজেই চিনিয়ে দিলেন। কয়েক বছর ধরে রামনবমীর শোভাযাত্রা কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়, শেষপর্যন্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়। একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফরমান জারি করে বসলেন রামনবমীতে কোনও অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা করা চলবে না'। এক কথায়, 'রামকে নিয়ে মাতামাতি আমি বরদাস্ত করবো না।' কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে রামনবমীর শোভাযাত্রায় পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় দলের গুন্ডাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। উল্টে আসল অপরাধীদের পুলিশ না ধরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের তুলে নিয়ে গিয়ে থানার লকআপে ভরে দিয়েছে এবং নানারকম কেস দিয়ে তাদের জীবন জেরবার করে তুলছে। একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট নিয়ে কতটা অসহিষ্ণু হতে পারেন উনি ক্ষমতায় আসীন হয়ে বারবার নজির স্থাপন করছেন। গত ৪ মে তারিখে মেদিনীপুর থেকে নির্বাচনের কাজে ফেরার পথে চন্দ্রকোনায় ঢোকার মুখে গোপীবল্লভপুরে কতকগুলি ছেলে জয়শ্রীরাম ধ্বনি দিলে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গাড়ি থেকে নেমে ধমকের সুরে বলতে আরম্ভ করলেন— 'পালাচ্ছিস কেন? আয় আয়। আমাকে গালাগালি! হরিদাস পাল কোথাকার।' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। জয়শ্রীরাম ধ্বনি গালাগালি হয়ে গেল! ফেসবুক ও টিভিতে এদৃশ্য দেখানো হচ্ছে বারবার। যেসব ছেলে জয়শ্রীরাম ধ্বনি দিয়েছে তাদের কী অপরাধ ছিল যে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কনভয় থামিয়ে নেমে শাসাবেন। এই জয়শ্রীরাম ধ্বনির গুরুত্ব যদি হাফডজন ডিগ্রিধারী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গালাগালি হয় তাহলে বলবো যারা ওই জয়শ্রীরাম ধ্বনি অজান্তে দিয়েছিল তারা এই বঙ্গদেশে সকল হিন্দুর নিকট একটা সতর্ক বার্তা পাঠিয়ে দিলো— 'হে কুপমণ্ডুক হিন্দু জাগো, হে ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কী অসাধারণ ধর্মনিরপেক্ষতার অভিনয়। ভাবতে পারছি না যে রামনাম আজও তামাম ভারতবর্ষকে আপ্লুত করে রেখেছে দস্যু রত্নাকরের বাল্মিকী উত্তরণের পর তার লেখনীর জাদুমন্ত্রে। আজও জনমানসে বাল্মিকি লিখিত রামায়ণের আবেদনের কোনো ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় না। সেখানে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়শ্রীরাম ধ্বনিকে গালাগালি মন্তব্যে দেগে দিয়ে কদর্য নজির স্থাপন করলেন। হায়, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ!

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

প্রিয়ঙ্কার পদবি

বিবাহ-কালে হিন্দু মেয়েদের গোত্রান্তর হয়। সে কারণে, বিবাহের পর তাঁরা পিতৃ-পদবির পরিবর্তে তাঁদের স্বামীর পদবিতে পরিচিত হয়ে থাকেন। অহিন্দুদের মধ্যে গোত্র ব্যাপারটা নেই। তাহলেও তাঁদের সমাজের মেয়েরাও বিবাহের পর স্বামীর পদবি গ্রহণ করেন। যেমন, বিবাহের পর সোনিয়া মাইনো হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়া-তনয়া প্রিয়ঙ্কার স্বামীর নাম রবার্ট বঢরা। রীতি অনুসারে বিবাহের পর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর পদবি হওয়ার কথা 'বঢরা', কিন্তু পত্র-পত্রিকায় তাঁকে 'প্রিয়ঙ্কা গান্ধী' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, প্রিয়ঙ্কার মৌন সম্মতি না থাকলে তাঁর নামের সঙ্গে বিধি-বহির্ভূত 'গান্ধী' পদবি যুক্ত হতো না। আবার কখনো কখনো তাঁকে 'প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা' বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু, সেখানেও গোলমাল।

পাশ্চাত্যে, ক্ষেত্র বিশেষে, মেয়েদের স্বামীর পদবির সঙ্গে পিতৃ-পদবি উল্লেখ করা হয়, এবং সেখানে তাঁদের নামের পাশে প্রথমে স্বামীর পদবি, পরে পিতৃ-পদবি থাকে। কাজেই, পাশ্চাত্যের ওই ব্যতিক্রমী প্রথা অনুযায়ীও প্রিয়াঙ্কার পরিচয় হওয়া উচিত 'প্রিয়াঙ্কা বঢরা গান্ধী'; আরও স্পষ্ট করে বললে— 'প্রিয়ঙ্কা বঢরা nec গান্ধী' অর্থাৎ বিয়ের আগে প্রিয়ঙ্কার পদবি ছিল গান্ধী। তা না হলে, বিদেশের ওরা ভুল করে ভাববে প্রিয়াঙ্কার স্বামীর পদবি 'গান্ধী' এবং

চিঠিপত্র

পিতৃ-পদবি 'বঢরা'। প্রসঙ্গত আর একটি কথা। প্রিয়াঙ্কার শ্বশুরকুলের পদবি 'ভদ্র' (দ্র: সা: বর্তমান, তাং ২৬.১১.২০১১)। সেই পদবি কখন কীভাবে 'বঢরা' হয়ে গেল, জানা নেই। মনে হয়, রবার্ট বঢরার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মাতা মৌরিনের উচ্চারণ-বিভ্রাটের অন্যতম কারণ।

–বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

মাসুদ আজহার আন্তর্জাতিক জঙ্গি ভারতের কূটনৈতিক জয়

অবশেষে ঘোষিত হলো জৈশ প্রধান মাসুদ আজহার আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে। ভারতের দীর্ঘদিনের কামনা ছিল মাসুদকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু বাস্তবে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। সেটা অবশ্য পাকিস্তানের একমাত্র বন্ধু চীনের বদান্যতার জন্য। এতে নাকি পাকিস্তানের চীন প্রীতি নষ্ট হয়। বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশ ভারতের ইচ্ছাকে সম্মতি দিলেও চীনের গড়িমসির জন্য এটা আটকে ছিল। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফল বৈদেশিক কূটনীতির কারণে সম্ভব হলো। বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর নাম আরও দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতে এটা অবশ্য কিছু নেতা-নেত্রীর গোসার কারণ হয়ে দাঁড়াল কারণ ভোটের এখনো দু' দফা বাকি। এতে ভোট যে মোদীর অনেকটা বাড়বে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই কুখ্যাত ব্যক্তিটি নাকি পাকিস্তানে থাকে না। পৃথিবীর বাইরে থাকে। তাই পাকিস্তানের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে সে কোথায় আছে। এই খ্যাতিমানটির মুক্তির জন্যই ভারতের ৩০০ জন যাত্রী-সহ একটি বিমান ছিনতাই করা হয়েছিল আফগানিস্তানের ঘাঁটিতে।

তখন ভারতের বাজপেয়ী সরকার বাধ্য হয়েছিল তাকে ফেরত দিতে, ৩০০ জনের প্রাণ রক্ষার তাগিদে। এটার জন্য তখনো কম জল ঘোলা হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সহমত সত্ত্বেও পরে তারা এটিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছিলেন। বর্তমানে এই জয়কে একটা সাধারণ এবং নাক সিটকানো ঘটনা বলে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। নচেৎ ভোটের বাজারে তাদের দর কমে। এই কুখ্যাত জঙ্গিকে অনেক নেতা সম্মানের সঙ্গে মাসুদজী বলে বিশেষিত করেছে। জানি না এর পেছনে তাদের কীসের অভিসন্ধি আছে। কারো কৃতকর্মের জন্য কেউ যদি খ্যাতি অর্জনের শীর্ষে ওঠে সেটাকে তাচ্ছিল্য করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া কী বলা যেতে পারে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

লোকসভা নির্বাচনে কাদের হাত শক্ত করবেন?

ভারতের ভবিষ্যৎ কাদের হাতে যাবে, কারা নিয়ন্ত্রণ করবে দেশের রাষ্ট্রনীতি, সমাজ নীতি, বিদেশ নীতি, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ইত্যাদি। নেহরু, ইন্দিরার বংশধররা এই দেশকে একটা রাষ্ট্র হিসাবে গণ্যই করে না। ভারতীয়দের একটা প্রাচীন সংস্কৃতি আছে, পরম্পরা আছে, সেটাকে মান্যতা না দিয়ে সুকৌশলে স্বাধীনতার পর থেকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে সমস্ত শ্রদ্ধার কেন্দ্রস্থল আছে সেগুলোকে রক্ষা করা বা পুনরুদ্ধার করাকে তারা সাম্প্রদায়িকতা ভাবে। দেশের রক্ষাকবচ সংবিধানকে তারা বার বার নিজেদের প্রয়োজনে সংশোধন করেছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা, 'ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।' —সাল এবং তারিখ হিসাবে কথাটি কি সত্যি? ১৯৪৯ সালে ২৬ নভেম্বর ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে প্রস্তাবনা লেখা হয়েছিল তাতে 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি ছিল না। ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী সুকৌশলে নিজের প্রয়োজনের ভারতীয় চরিত্রকে পাল্টে দিয়ে শব্দদুটিকে এমনভাবে ঢুকিয়েছেন যেন পড়লে মনে হবে ১৯৪৯ সাল থেকেই শব্দদুটি সংবিধানে ছিল— এটা কী একটা জালিয়াতি নয়? যখন এই শব্দদুটি ঢোকানো হলো তখনকার সময় উল্লেখিত হলো না কেন? বর্তমান প্রজন্মকে সংবিধান সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে না? অতি বামপন্থী স্লোগান 'দেশ তেরে টুকড়ে টুকড়ে হোঙ্গে ইনসাল্লা ইনসাল্লা। তুম কিতনে আফজল মারোগে, ঘর ঘর আফজল নিকলেগা। মণিপুর মাঙ্গে আজাদি, মিজোরাম মাঙ্গে আজাদি, নাগাল্যান্ড মাঙ্গে আজাদি, অসম মাঙ্গে আজাদি' বলে দেশের অখণ্ডতাকে নষ্ট করতে চায় যারা তাদের সারা ভারতে বীরের সম্মান দেওয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের তুষ্ট করার জন্য মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওকাণ্ডে সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে হিন্দু আতঙ্কবাদের মিথ্যা তত্ত্ব যারা খাড়া করে তাদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেবেন? পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গি শিবির ধ্বংসে কতজন মারা গেল বা সত্যিই কেউ মারা গেছে কিনা বলে ভারতীয় সেনাদের যারা অপমান করে তাদের হাতে দেশের ভার তুলে দেবেন? নাকি আপস্ফা আইন তুলে দিয়ে যারা জম্মু-কাশ্মীরে সেনা বাহিনীকে পাথর ছুঁড়ে আক্রমণ করেছে তাদেরই হাত শক্ত করতে চাইছে, তাদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ তুলে দেবো? তাই বাকি নির্বাচনের দিনগুলিতে আপনার মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করুন।

—সঞ্জয় মুখার্জী,
হাওড়া, শিবপুর।

ইসলামের দুটি চোখ

ইসলামের চোখে মহম্মদ ঘোরির অমর কীর্তি হলো ১৭ বার ভারত আক্রমণ। আর অন্যতম কাজ ছিল মন্দির ধ্বংস, হিন্দু হত্যা, নারী ধর্ষণ, ও দেশ দখল এবং ধর্মান্তরকরণ। এইসব কাজের জন্য আজও পাকিস্তানের মুসলমানরা গর্বিত। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কিছু মুসলমানও ঘোরির ভারত আক্রমণের সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো—

১। ১০০০ সালে ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ। ২। ১০০১ সালে পাশোয়ার, ৩। ১০০৫ সালে ভাতিণ্ডা, ৪। ১০০৬ সালে মুলতান, ৫। ১০০৭-০৮ সালে মুলতান। ৬। ১০০৮-১০০৯ সালে পেশোয়ার, ৭। ১০০৯ সালে নারায়ণপুর আলোয়ার, ৮। ১০১০ সালে মুলতান, ৯। ১০১৩-১৪ সালে থানেশ্বর, ১০। ১০১৪ সালে নন্দন, ১১। ১০১৫-১৬ সালে কাশ্মীর, ১২। ১০১৮-১৯ সালে মথুরা কনৌজ, ১৩। ১০১৯ সালে কনৌজ, ১৪। ১০২১ সালে কাশ্মীর, ১৫। ১০২২ সালে গোয়ালিয়র, ১৬। ১০২৫ সালে কলিঞ্জর, সোমনাথ, ১৭। ১০২৭ সালে সিন্ধু।

সোমনাথ মন্দির শুধুমাত্র সুলতান গজনি দ্বারা আক্রান্ত, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়নি, আরও অনেক মুসলমানদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা ইসলামের স্বাভাবিক ধর্মের মধ্যেই আছে। তবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির এর থেকে কম বার মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও, বেশি ক্ষতিসাধন, নরহত্যা, সম্পত্তি লুঠ, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি সোমনাথ মন্দিরেই বেশি হয়। অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো :

১। ৭২৫ সালে---আলজুনাদে, ২। ১০২৪ সালে—মহম্মদ গজনি, ৩। ১২৯৯ সালে—উলখান (আলাউদ্দিনের সেনা), ৪। ১৩৯৫ সালে---জাফরান, ৫। ১৪৫১ সালে—মহম্মদ রাগাদা, ৬। ১৫৪৬ সালে—গোয়ার পর্তুগিজ, ৭। ১৬৬৫ সালে---আওরঙ্গজেব প্রভৃতি নবাব বাদশাহদের দ্বারা হিন্দু, হিন্দুস্থান ও হিন্দুসংস্কৃতির উপর বারে বারে আঘাত আসে। আজও কিছু ভারতীয় নেতাকে মহম্মদ ঘোরির অনুগামী হতে দেখা যায়। আর বাঙ্গলায় তো যোগেন মণ্ডলের ছড়াছড়ি। এ ভারতকে একা মোদী রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

লবঙ্গ ও দারুচিনি শুধু মশলা নয়, মহা উপকারী ভেষজ

অসিতবরণ আইচ

লবঙ্গ

● দেখতে ছোটো। বহু গুণে গুণান্বিত। ক্লোভ ওয়েল আছে লবঙ্গে। একটু ঝাঁঝালো। রান্নাকে সুগন্ধিত করে।

● হাঁটু বা জয়েন্টের ব্যথায় হালকা ভাজা লবঙ্গ সুতির কাপড়ে পুটলি করে সেঁক দিলে ভালো হয়।

● হালকা ভাজা লবঙ্গের গুঁড়ো খেলে গুঁড়োকৃমি দূর হয়।

● মুখে দুর্গন্ধ দূর করতে লবঙ্গের জুড়ি নেই। দু-চারটে লবঙ্গ মুখে রাখলেই হলো।

● মুখের ব্রণ দূর করতে লবঙ্গচূর্ণ মধু মাখিয়ে লাগাতে হবে।

● গরম জলে লবঙ্গ ফুটিয়ে পান করতে। লবঙ্গ-চা অত্যন্ত উপকারী।

● লবঙ্গ-চা ক্ষুধা বাড়ায়, হজমে সাহায্য করে। লিভারের ক্ষমতা বাড়ায়।

● জ্বরের প্রকোপ কমায়; বিশেষ করে ভাইরাল ফিভার।

● লবঙ্গ চিবোলে শরীর তরতাজা হয়।

● সাইনাস ইনফেকসনের সমস্যা দূর করে লবঙ্গের ঘ্রাণ নিলে।

● লবঙ্গ -চা ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে সেই চা ব্যথা স্থানে লাগালে খুব উপকার হয়।

● দাঁতের ব্যথায় লবঙ্গ থেতো করে লাগলে আরাম মেলে।

● গর্ভবতীর বমি বমি ভাব দূর করে লবঙ্গ চুষলে।

● এক চিমটি ভাজা লবঙ্গচূর্ণ গরমজল-সহ সকাল-বিকাল খেলে পাতলা পায়খানা বন্ধ হয়।

● লবঙ্গগুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে বমিভাব কমে, বেশি পিপাসাভাব কমে।

● মাথার ব্যথায় লবঙ্গ তেল ব্যবহার করুন।

● লবঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক আছে। ক্যানসার রোধ করে।

● লবঙ্গ চুষলে মুখের অরুচিও দূর হয়।

দারুচিনি

● দারু মানে গাছ। গাছের ত্বক এবং স্বাদে মিষ্টি। কেউ কেউ দালচিনি বলি। কেউ কেউ দারচিনি বলি। সুন্দর গন্ধ, শরীরে তেজ-বল আনে, ভালো হজম করে এবং কামোদ্দীপক।

● দারুচিনি শুধু রান্নায় ব্যবহৃত একটি মশলা নয়, এর ঔষধীয় গুণ অনেক। চূর্ণ





বা বাটা বা তেল রূপে ব্যবহার করা যায়।

● প্রায় পঞ্চাশটা ব্যাধির মহৌষধ দারুচিনি। এর চূর্ণ মধু বা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে চাটলে বহু রোগ দূর করে।

● ডায়াবেটিসের মহৌষধ, দারুচিনির চূর্ণ এক চিমটি দৈনিক খেলে রক্তের মিষ্টতা দূর করে।

● হাঁপানি দূর করে, বায়ু সংক্রান্ত সব রোগ দূর করে। রক্ত চলাচলে স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে রাত্রে দুধের সঙ্গে এক চিমটি দারুচিনি চূর্ণ খেলে। হাঁটুর ব্যথাও কমায়।

● খাওয়ার পর এক চিমটি দারুচিনি চূর্ণ গরমজল-সহ খেলে হজম ভালো হয়। বায়ুমুক্ত হবে পেট।

● খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, বাতের ব্যথা কমায় খালি পেটে মধুসহ দারুচিনি চূর্ণ খেলে।

● দুধের সঙ্গে ২-৩ গ্রাম দারুচিনি বেটে দাদ-একজিমায় লাগালে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়।

● পৌনে এক চামচ দারুচিনির সাথে পাঁচ চামচ মধু খেলে হার্ট খুব ভালো থাকে।

● চায়ের সঙ্গে দারুচিনি চূর্ণ মিশিয়ে খেলে শরীরের দুর্বলতা দূর হয় কর্মে উৎসাহ পাওয়া যায়।

● পিত্তথলি, কিডনি, লিভারে সংক্রমণ প্রতিরোধে দারুচিনি ভূমিকা রয়েছে।

● গরম দুধে বা জলে ২ চিমটি দারুচিনি চূর্ণ মিশিয়ে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্ককে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

● ভাইরাল ইনফেকশন ও অ্যালার্জি দূর করে।

● মাসিকের আগে ৩/৪ গ্রাম দারুচিনি ৩ কাপ গরমজলে সেদ্ধ করে খেলে সব ঠিকঠাক থাকবে।

● সরষের তেল বা অলিভ অয়েলে দারুচিনি গরম করে পেশি ব্যথায় মালিশ করা যেতে পারে।

● মাখনের সঙ্গে দারুচিনি চূর্ণ খেলে অর্শ-ভগন্দরে উপকার পাওয়া যায়। ▮

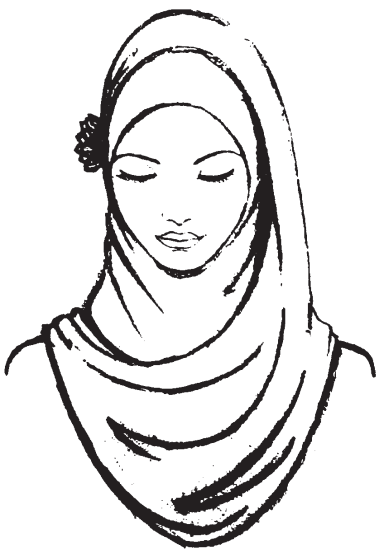
বিশেষ সম্প্রদায়ের তথাকথিত মেধাবী শিক্ষিত প্রজন্ম দেশকে কোন দিশায় নিয়ে যাচ্ছে?

অঙ্গনা

সোমেশ বৈষ্ণব

এবছর মালদার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় থেকে সিবিএসসি-র মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ কৃতী বালিকার নাম সবাই জানেন এবং তার হিজাব পরিহিত ছবি সবাই দেখেছেন। পূর্ণমান ৫০০-র মধ্যে ৪৯৭ পাওয়া ওই কন্যার তারিফ করতেই হয়। কিন্তু সমস্ত সংবাদমধ্যমে প্রকাশিত ওই কিশোরীর ছবি কিছু প্রশ্ন ও শঙ্কা জাগায়। মেয়েটি কোনো খরিজি মাদ্রাসার ছাত্রী হলে ব্যাপারটা বোঝা যেত; কিন্তু শৈশবকাল থেকে বেশ কয়েবছর একটি কেতাদুরস্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ার পরও কেন সেই বাচ্চা মেয়েটিকে হিজাবের আড়ালে থাকতে হয়? কেন সে নিজের মতো করে পৃথিবীর রং-রস-গন্ধ অনুভব করতে পারবে না? কৃতী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন এভাবে পর্দানশীন হয়ে থাকতে তার আপত্তি হচ্ছে না? যে বাবা-মা মেয়েকে মাদ্রাসায় না পাঠিয়ে মূল ধারার বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন তাঁরাই বা কেন এই কুসংস্কার মানতে একটি শিশুটিকে বাধ্য করছেন? মেয়েটির বাবা একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তার ছোটো বোন একই স্কুলে পড়ে এবং হিজাবে অভ্যস্ত। মেয়েটির মা-ও ব্যতিক্রম নন। মেয়েটিকে ইতিমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি সংগঠন সংবর্ধনা দিয়েছে।

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। খুব সুকৌশলে এরাজ্যে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা হলো সম্পন্ন শিক্ষিত পরিবারের সন্তানেরা খরিজি মাদ্রাসায় যাবে না, তারা মূল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণ করবে, কিন্তু মগজে ইসলাম আরও বেশি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এরা উচ্চ সরকারিপদ অধিকার করবে আর নীরবে ইসলামের প্রসারে কাজ করবে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এ রাজ্যের বেশ কিছু ডবলুবিসিএস, পুলিশ বা অন্যান্য আধিকারিকদের পেজ অনুসরণ করলে এই প্রবণতার একটা আঁচ পাওয়া যাবে। উত্তর চবিশ



পরগনার খলতপুর নামের প্রত্যন্ত গ্রামে ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া ইসলামিক মিশন আজ সারা রাজ্যে শাখা বিস্তার করেছে। যেটি লক্ষ্য করার তা, হলো এদের বিশাল বিশাল হস্টেলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী থাকে, কোচিং নেয়, কিন্তু এরা সরকারি অনুমোদন নিয়ে কোনও বোর্ডের অধীনে কোনও স্কুল চালায় না। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এদের ছাত্র-ছাত্রীরা হোস্টেল সংলগ্ন এলাকার স্কুলগুলোতে নাম লিখিয়ে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। এরা স্কুলে যায় না, ক্লাসও করে না। তাদের সব 'শিক্ষা' হোস্টেলেই দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য যেকোনো বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে প্রথামাফিক মূল ধারার স্কুল খুললে সেখানে নির্দিষ্ট সিলেবাস মানতে হবে, কিছু সরকারি নিয়মও মানতে হবে যেগুলো যথাযথ 'হালাল' নাও হতে পারে; এজন্যই বিশাল পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও তারা শুধু 'হোস্টেল' চালায়, স্কুল চালায় না।

এভাবে মূল ধারার আধুনিক শিক্ষার সুবিধা নিয়ে একটি চরম মৌলবাদী শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলা হচ্ছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, সাধারণ সরকারি বেসরকারি স্কুল বা কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিজাব পরা বা রোজা রাখার বিশেষ চল দশ বছর আগেও ছিল না। কিছু বিশেষ উর্দুভাষী এলাকাতেই এদের দেখা যেত। কিন্তু এখন এই প্রবণতা দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে। একটি ক্লাস ফাইভ বা সিক্সের মেয়ে হিজাব পরে স্কুলে এলে তার পাশে বসা হিন্দু ছাত্রীটির মনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এনিয়ে কিন্তু নারীবাদী বা শিশু অধিকার রক্ষায় যারা সদা ব্যস্ত তাদের কোনও কথা দেখা যায় না। এভাবে শৈশব থেকেই যাদের পৃথক ভাবতে শেখানো হয় বড়ো হয়ে তারা কীভাবে দেশের সংহতির শরিক হবে? নারীর অধিকার, শিশুর অধিকার এসব নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? শৈশব থেকেই যে হিজাব বা বোরখায় অভ্যস্ত হবে সে কি তিন তালাকের প্রতিবাদ করতে পারবে?

কেউ আশা করেন কি এই শিক্ষিত মুসলমান প্রজন্ম মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আনুগত্য অতিক্রম করে দেশের প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারবে? এদেশে-বিদেশে একাধিক তথাকথিত কৃতী শিক্ষার্থীর আইএস বা বিভিন্ন অপারেশন অংশ নেবার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বছর দুয়েক আগে দিল্লির একটি অভিজাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রেপ্তার হওয়া তিন ছাত্র গোয়েন্দা বাহিনীর চোখ কপালে তুলে দিয়েছিল। আলিগড় বা জেএনইউ-এর ক্যাম্পাসে কারা সক্রিয় তাও সবার জানা। আর কাশ্মীরে কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সেনাবাহিনীর দিকে পাথর ছুঁড়তে উৎসাহিত করা হয় তা সবার জানা। পশ্চিমবঙ্গেও ছবিটা খুব স্বস্তির নয়। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কৌশলে একটি মৌলবাদী গোষ্ঠী গড়ে তোলা হচ্ছে। তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক কোচিং সেন্টার, হোস্টেল ইত্যাদি তৈরি করে তাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। শৈশব থেকে হিজাব, বোরখা বা ধর্মীয় জলসায় অভ্যস্ত হয়ে তারা খুব সহজেই মৌলবাদের পাল্লায় পড়ে দেশবিরোধী শক্তির হাতের পুতুল হয়ে পড়ছে। ▮

শাসকের নজিরবিহীন সন্ত্রাসে রক্তাপ্লুত বাঙ্গলা



ঝাড়গ্রামে নিহত বিজেপি কর্মী রমন সিংহ

তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না। এবারের লোকসভা নির্বাচনের ছয় দফা ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এবং তৃণমূলের জল্লাদবাহিনী এখনও পর্যন্ত দিদির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ষষ্ঠ দফার ভোটে পশ্চিমবঙ্গে বেলাগাম সন্ত্রাস হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ঘাটাল ও মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ ও দিলীপ ঘোষ-সহ বহু বিজেপি কর্মী। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র হাতে তৃণমূলের গুণ্ডাদের রাস্তাঘাটে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা গেছে। হিংস্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী চার রাউন্ড গুলি চালিয়েছে কেশপুরে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও, তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি গোষ্ঠীসংঘর্ষে মারা গেছেন একজন তৃণমূল কর্মীও। আহত বহু।



আহত বিজেপি কর্মী শান্তনু দাস।

ষষ্ঠ দফার ভোট গ্রহণে সন্ত্রাসের সূত্রপাত ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেশপুরে। এখানকার বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ জানতেন পরিস্থিতি অনুকূল নয়। স্থির করেছিলেন কেশপুরের আমড়াকুচিতে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভোট করাবেন। সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু বুথের কাছাকাছি যেতেই শুরু হয় তাকে লক্ষ্য করে ইঁটবৃষ্টি। তাকে ঘিরে ধরে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় ভারতীকে। তার পায়ের নখ উপড়ে যায়। অপমানে কেঁদে ফেলেন ভারতী। এই সময় ভারতীকে লক্ষ্য করে বোমাও ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, ভারতীকে খুন করারই চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। উন্মত্ত তৃণমূলিদের ছত্রভঙ্গ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী শূন্যে চাররাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। ভারতীর অভিযোগ, কেশপুরে ছাপ্পা আর রিগিং বন্ধ করার জন্য তিনি বুথে গিয়েছিলেন। বিজেপির পোলিং এজেন্টকে বুথে বসানো ছিল আরেকটি লক্ষ্য। ছাপ্পাবাজরা সেটা বুঝতে পেরে সন্ত্রাস শুরু করে।

অন্যদিকে ভোট নিয়ে অশান্তি হয়েছে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রেও। এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীরা। ভাঙচুর করা হয় তার গাড়ি। ঝাড়গ্রামে এক বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মৃত ব্যক্তির নাম রতন সিংহ। তিনি বিজেপির বুথ সভাপতি ছিলেন। ঘাটালে বিজেপি করার অপরাধে একটি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয় এবং মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লুঠপাটও চলে।

বেলাগাম সন্ত্রাসের মধ্যেও আট কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮০.১৬ শতাংশ। দিনের শেষে বিজেপি নেতারা আশার কথাই শুনিয়েছেন। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বেশ হাসিখুশি ছিলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানস ভুইঞা ছিলে উদ্বিগ্ন। বিষ্ণুপুরের প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'আমার কেন্দ্রের কয়েকটি বুথে তৃণমূল রিগিং করলেও দেড় লক্ষ ভোটে জিতব।' ■



কান্নায় ভেঙে পড়লেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ।



রক্তাক্ত ভারতী ঘোষের দেহরক্ষী।

ভোটের দিনে তৃণমূলের সন্ত্রাস : দশ বছর আগের বিহারকেও হারিয়ে দিয়েছে

অভিমন্যু গুহ

ভোট চলাকালীন একটি খবর প্রকাশ্যে এসেছিল যে তৃণমূলের জল্লাদ বাহিনী জলপাই পোশাক পরে তৈরি হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী, জওয়ানদের সঙ্গে এই পোশাকের সাদৃশ্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুথে বুথে তৃণমূল সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করেছিল, যাদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল তৃণমূলের আমলে এবং তৃণমূলের ক্যাডার হওয়াই ছিল যাদের যোগ্যতার মাপকাঠি। এদের 'নিরাপত্তা'য় রাজ্যের সাধারণ মানুষ গত পঞ্চায়েতে ভোট দিতে না পারলেও, তৃণমূলের জল্লাদ বাহিনী 'অবাধে' ভোট দিয়েছিল। প্রায় অর্ধেক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর বাকিগুলির অধিকাংশতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না দিয়ে জিতে গিয়েছিল তৃণমূল।

কিন্তু বছর ঘুরতে পরিস্থিতিটা আমূল পল্টেছে, বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতির সম্ভাবনায় আতঙ্কিত তৃণমূল তাদের জল্লাদ বাহিনীকে ওই ধরনের পোশাক পরিয়ে 'ক্যামোফ্লেজ' করতে চেয়েছিল, রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখানো ব্যতীত ৪২-এ ৪২-র স্বপ্নে বিভোর তৃণমূলের ভাগ্যে যে একটাও আসন জুটবে না, মমতা ব্যানার্জির চেয়ে ভালো আর কে-ই বা জানে। তাই সারা দেশে নির্বাচন যখন উৎসবের মেজাজে হচ্ছে, তখন কংগ্রেস সিপিএম শূন্য পশ্চিবঙ্গে একমাত্র বিরোধী বিজেপির কর্মীরা বুক ঠুকে আসরে নেমে তৃণমূলের হাতে মার খাচ্ছে ভোটের প্রতিটি দিন। মমতা ব্যানার্জির যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে নির্বাচনে কমিশনের প্রতি, কেন তারা সর্বোচ্চ সাত দফাতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করছে, কেন প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে।

সারা ভারতের ভোট উৎসবের চিত্রটার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা মেলালেই বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক কেন দশ বছর আগের অশান্ত বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করেছেন। এও বোঝা



যাচ্ছে কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া নির্বাচনের কাজে যেতে সরকারি চাকুরিজীবীরা ভয় পাচ্ছেন, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ২০১৬-য় রায়গঞ্জে রাজকুমার রায়ের অভিজ্ঞতার টাটকা ক্ষত এখনও যে তাঁদের মনে। এর পরেও প্রথম দফায় অধিকাংশ বুথেই ছিল না কেন্দ্রীয় বাহিনী। মাত্র দু'টি আসনের লোকসভা ভোটে তাই অবাধে বুথ দখল আর ছাপ্পা ভোটের কারবার চালিয়েছে তৃণমূলের ভোট লুঠেরা। সিতাইয়ে ভিভিপ্যাট (অর্থাৎ আপনি কাকে ভোট দিয়েছেন, যে যন্ত্রের সাহায্যে বোঝা যায়) ভাঙচুরের ঘটনা থেকে শুরু করে, দিনহাটায় বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া, সারাদিন শাসক দলের দাপাদাপিতে সাধারণ মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেমনভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন তা বোঝাই যাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ অধিকারীকে তিনশো বুথে পুনর্নির্বাচন চেয়ে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ধরনাতে পর্যন্ত বসতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় দফাতেও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। এই পর্যায়েও অল্প আসন— রায়গঞ্জ, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। বিক্ষিপ্ত হিংসা, অশান্তি অব্যাহত ছিল। বুথ দখল, ভোট জ্যাম, ছাপ্পা প্রতিটা কেন্দ্রেই কোথাও না কোথাও তৃণমূলি গুন্ডারা সংঘটিত করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে প্রথম দু'দফার ভোটে অর্ধেকেরও কম বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল, কিন্তু একমাত্র বিরোধী হিসেবে বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী হওয়ার দরুন প্রতিরোধের কিছুটা সুযোগ অন্তত পাওয়া গিয়েছিল। তবুও সামগ্রিক চিত্রটা বেশ হতাশাজনক। তৃণমূলের ভয়ে ঘরবন্দি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছেন এক সাংবাদিক, এমন দৃশ্যও টেলিভিশন চ্যানেল আর সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে রাজ্যবাসী দেখেছেন। এর জন্য সংশ্লিষ্ট চ্যানেল কর্তৃপক্ষের রোষে সেই সাংবাদিকটি পড়বেন কিনা সেটা সময়ই বলবে, কিন্তু গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তরের অবক্ষয়ের যুগে এই চিত্র বেশ আশাব্যঞ্জক। দুর্ভাগ্য হলো, যে কাজটা করার ছিল স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর, কিন্তু শাসকদলের প্রতি প্রশাসনের আনুগত্য ও বাহিনীর অনুপস্থিতিতে এক কাজটা একজন অত্যন্ত স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন সাংবাদিককে অসীম সাহসিকতায় সম্পন্ন করতে হচ্ছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

প্রথম দু'দফার অভিজ্ঞতা থেকে তৃতীয় দফায় কমিশন আরেকটু সচেতন হয়। নব্বই শতাংশ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়।



কিন্তু তৃণমূলের প্রকৃত স্বরূপ এই ভোটপর্ব থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন ষষ্ঠ দফা ভোটপর্ব মিটে গিয়েছে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ— এই চার দফায় শাসক দলের হিংসার যে নমুনা দেখা গিয়েছে, সপ্তম দফাতেও তা বজায় থাকবে আশঙ্কা করা যায়। সেই সঙ্গে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রের একটি অঙ্গরাজ্যে গণতন্ত্র কীভাবে ভূলুণ্ঠিত হলো তার সাক্ষী থাকবে ইতিহাস।

তৃতীয় দফার ভোট ছিল বহরমপুর বাদে মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ মালদা ও বালুরঘাটে। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের কিছুটা শক্তিশালী, অধীর চৌধুরীর সৌজন্যে। শাসকের হামলায় ভগবানগোলায় নিহত হন এক কংগ্রেসকর্মী। এবারের লোকসভা নির্বাচনের দিন প্রথম প্রাণ হারান দলীয় কর্মী। ডোমকলে মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা পড়তে থাকে, ডোমকল এমনিতেই অশান্ত এলাকা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কখনও তৃণমূল, কখনও কংগ্রেস, যখন যেখানে সুযোগ পায় আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক দলগুলি যতদিন না এদের প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করবে, ডোমকল-সহ গোটা মালদা-মুর্শিদাবাদে ভারতীয় ভোটাররা অবাধে, শান্তিতে যে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না, তা ডোমকল দেখিয়ে দিয়েছে। মালদায় ইভিএম ভেঙেছে তৃণমূল। অশান্তি হয়েছে বালুরঘাটেও। তপনে তৃণমূলের হাতে বিজেপি কর্মী নিগৃহীত। পুলিশ দর্শকের ভূমিকায় ছিল। স্থানীয়রা প্রতিবাদে নামলে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় পুলিশ।



চতুর্থ দফাতেও নির্বাচনী হিংসা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। এই পর্বে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান (পূর্ব), বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হয়। এর মধ্যে দুটি আসন বিরোধীদের দখলে, বাকিগুলিতে কোনওটাতেই তৃণমূল সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। সাংসদ ও মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র গাড়ি ভাঙচুর হয়, তাঁর পোলিং এজেন্টকে মারধর করা হয়। এই অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছেন বাবুলের প্রতিপক্ষ মুনমুন সেন। সকাল থেকে তাঁর দাঁড়ানো কেন্দ্রে অশান্তি, অথচ তিনি কী করছেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অকপটে দুপুর নাগাদ মুনমুন জানিয়ে দেন, হোটেলে তাঁর বেড-টি দিতে দেরি হয়েছে, তাই ঘুম ভাঙেনি, যে কারণে কোনও গণ্ডগোলের খবর তিনি রাখেন না। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়েছিল যে, কালনায় খোদ বিজেপি প্রার্থী পরেশচন্দ্র দাস তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হাতে আহত হন। পূর্বস্থলীতে পাল্টা প্রতিরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। বীরভূমের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিজেপি সমর্থকদের ভোট দিতে বাধা দেয় অনুব্রতর গুন্ডারা। নানুরের রাস্তায় নেমে পড়ে মা-বোনেরা তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের সন্ত্রাস রুখতে চেষ্টা করেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দুবরাজপুরে শূন্যে গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। দুর্গাপুরেও কয়েকদফা সংঘর্ষে বিজেপি কর্মীরা গুরুতর জখম হন। সব মিলিয়ে চতুর্থ দফা ভোটের দিন সরকারি হিসেবে মোতাবেক এফআইআর হয়েছে ৬টি, গ্রেপ্তার ১৪৫; অভিযোগ এসেছে ৬০০টি, আহতের সংখ্যা ৫। এই অশান্তির রেশ ভোটের পরের দিনও অব্যাহত ছিল। বোলপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, বর্ধমানে র‍্যাফ নামানো, দুর্গাপুরে বিজেপির ওপর হামলায় আহত অন্ততপক্ষে কুড়ি, মঙ্গলকোটে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে স্থানীয় জনজাতিদের পথ অবরোধ, নাদনঘাটে বল্লম নিয়ে মহিলাদের পর্যন্ত তৃণমূলিদের আক্রমণ, আউশগ্রামেও অশান্তি হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফার অশান্তি অবশ্য সবকিছুকে টেক্কা দিয়েছে। এই দুই দফার অশান্তির ক্ষত রাজ্যবাসীর মনে এখনও টাটকা। একদা এলাকায় যাদের দোর্দণ্ডপ্রকাপ ক্ষমতা প্রদর্শন চলত সেই ব্যারাকপুরে অর্জুন সিংহ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল লোকসভার অন্তর্গত কেশপুরে ভারতী ঘোষ যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফায় শাসকদলের রোষের মুখে পড়েছিলেন, শুধু তাই নয় বিরোধী এজেন্টকে বসতে না দিয়ে। ভারতীর ক্ষেত্রে অবস্থা তো আরও নক্কারজনক। তাঁকে নানা অজুহাতে ভোটের আগে থেকেই বিভিন্ন জায়গায় আটকানোর চক্রান্ত হয়েছিল। ভোটের দিন তাঁর গাড়ি পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। যারা নীতিমতো উল্লসিত বোধ করছেন ভারতী কিংবা অর্জুনের ঘটনায়, তাঁরা হয়তো বোঝেন না বা বুঝতে চান না, তৃণমূল শাসকের ক্ষমতার দম্ভে ভারতী কিংবা অর্জুন ছিলেন প্রতীক মাত্র। তাঁরা ভিন্ন পথে হাঁটতে অত্যাচারী শাসক আজ প্রতিশোধ স্পৃহায় মেতেছে। সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব কী বিপদজ্জনক আকার ধারণ করতে বাম-জমানা তার প্রমাণ। তৃণমূল জমানাও সেই একই পথের শরিক।

মজার ব্যাপার হলো, যাঁরা তাত্ত্বিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব তাঁদের আমলেই সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই বামেরা অর্জুন-ভারতীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব দেখিয়ে প্রকারান্তরে তৃণমূলের গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধকে সমর্থন করেছেন। পঞ্চম দফার নির্বাচনে হাওড়া-হুগলিতে বিজেপি কর্মীরা ভোটের আগে থেকে ভোটের দিনও যথেচ্ছ আক্রান্ত হয়েছেন। হুগলিতে লকেট চট্টোপাধ্যায়, হাওড়ায় রন্তিদেব সেনগুপ্তের লড়াকু মনোভাবে অত্যাচার কিছুটা ঠেকানো গেলে পঞ্চম দফার নির্বাচনে দিনের শেষে হিসাব এফআইআর-এর সংখ্যা ৫, গ্রেপ্তারি ৪২, অভিযোগ এসেছে ২৫৬০টি, আহতের সংখ্যা ১৪। ষষ্ঠ দফায় আহত হয়েছেন ২৬ জন, গ্রেপ্তার ১৬ জন। এই দফায় দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় ভোট ছিল। ভোট শুরুর আগেই ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে বিজেপির বুথ সভাপতিকে খুন হতে হয়। তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হাতে ইতিপূর্বে নিহত পুরুলিয়ার শিশুপাল মাহাতোর বাড়িতে বাবা, দাদাকে লক্ষ্য করে ভোট পর্ব চলাকালীন হামলা চালায় তৃমমূলীরা।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা। সব দেখেও চোখে ঠুলি এঁটে তাঁরা হিংসা-দ্বীর্ণ নির্বাচনকে 'অবাধ, শান্তিপূর্ণ' বলে দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী একশো শতাংশ বুথেই থাকার কথা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি চোখে পড়ছে না বলেই অভিযোগ। এও মনে হচ্ছে যে তৃণমূলের তাঁবে থাকা এ রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকেরা নির্বাচন কমিশনকে বিপথে চালিত করছেন। ■

বাম নয়, ভোট সন্ত্রাসের জন্মদাতা কংগ্রেস

শৈবাল মৈত্র

অবিশ্বাস্য! কিন্তু এটাই সত্য যে ভারতবর্ষের নির্বাচনী ইতিহাসে ছাপ্পা ভোটের সূত্রপাত করেছিল কংগ্রেস এবং তা পশ্চিমবঙ্গেই-- যার অন্যতম রূপকার ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

১৯৪৯-এর ১৮ জুন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একটি মেমো এসে পৌঁছল। মেমো নম্বর ৯৪৩৪ টি.পি. ৬০৫। মেমোর মোদ্দা বক্তব্য— ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টররা এলগিন রোড পোস্ট অফিসে সূক্ষ্ম ভাবে অনুসন্ধান করে নেতাজীর বড়দা শরৎকুমার বসুর পুত্র অমিয়নাথ বসুকে লেখা একটি চিঠি হস্তগত করেছেন। চিঠির লেখক জনৈক মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি যাঁর ঠিকানা ২৪/৪, রসা রোড, কলকাতা। চিঠিটিতে শরৎ বসুর রাজনৈতিক উত্থানকে বানচাল করার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি কৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিটি এরকম : "এখন আমি কংগ্রেস অফিসে বসেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই চিঠিটি লিখছি। আমি জানি, এটা আমার অন্যায়। কিন্তু তথ্যটি আপনাকে না জানানোটা আরও বড়ো অন্যায় হবে বলেই আমি মনে কারি। আমি কংগ্রেস অফিসে দিনের একটা বড়ো অংশই কাটাই। এবং এখানে বসেই আমি জানতে পেরেছি, কংগ্রেস একটি গোপন সমীক্ষায় জানতে পেরেছে যে এবার ভোটে শরৎ বসু পাবেন ১৫০০০ ভোট। কংগ্রেস পাবে মাত্র ৬০০০। এর ফলে কংগ্রেস খুব চিন্তিত এবং তারা চাইছে যে কোনোভাবেই ভোটে জিততে। এজন্য তারা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে জয় হাতছাড়া না হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো নেতৃত্বের নির্দেশে একটা নতুন অফিস খোলা হয়েছে। এই অফিসের একটাই কাজ। মৃত ভোটারদের নামের তালিকা তৈরি করা। তাদের পরিকল্পনা হলো, ওই মৃত ভোটারদের নামে অন্য লোকজন ভোট দিয়ে যাবে। এছাড়া কলকাতায় বসবাস করছেন না, এমন ভোটারদের নামেও জাল ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কংগ্রেস। ব্যালট বক্স এবং ভোটের কৃৎকৌশল সম্বন্ধে আপনি যথাযোগ্য কড়া পদক্ষেপ নিন।"

কেন্দ্রীয় প্রশাসন তৎক্ষণাৎ ওই চিঠির লেখককে খুঁজে বের করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু খোঁজ করে দেখা যায়, ২৪/৪, রসা রোডে মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি নামে কেউ থাকেন না। আর ওই ঠিকানায় রয়েছে একটি কাগজ বই ইত্যাদির দোকানি এবং একটি গয়নার দোকান। কোন ভোটের কথা চিঠিতে বলা হয়েছে তাও স্পষ্ট নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশেই প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে।

নির্বাচন নিয়ে ধন্দ থাকলেও এটা স্পষ্ট যে ভারতে ছাপ্পা ভোটের চক্রান্তের ইতিহাস রচনা করেছিল সর্বপ্রথম কংগ্রেস। এবং ক্রমশই, রাজনীতি যত জটিল হয়েছে, রাজনৈতিক দল যেভাবে বেড়েছে এবং ভোটার সংখ্যাও যেভাবে বেড়েছে তার ফলে ভোটসন্ত্রাস, তা সে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যেমনই হোক না কেন, আরও ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে।

নেতাজী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছিলেন একটা উদ্দেশ্যে— একটি সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের তাঁবেদারি রাজনীতির বিরোধিতা করা। নেতাজী ছিলেন পুরোপুরি রাজতন্ত্র-বিরোধী একজন রাজনীতিবিদ। নেতাজী নিরুদ্দেশ হবার পর তাঁর বড়দা শরৎচন্দ্র বসু গঠন করেছিলেন সোশ্যালিস্ট রিফর্মার পার্টি। ১৯৫২-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ইংল্যান্ডে বসে তৈরি করছিলেন নির্বাচনী ইস্তেহার। সে কথাও তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন অমিয়নাথ বসুকে। সে চিঠিও কেন্দ্রীয় সরকার হস্তগত করে এবং চেষ্টা করে, তার পালটা ইস্তেহার তৈরির। যদিও শরৎচন্দ্র বসুর আর নির্বাচনে অংশ নেওয়া হয়নি। কারণ তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে সংসদ সদস্য হন তাঁর সুযোগ্য পুত্র অমিয়নাথ বসু। অর্থাৎ ছাপ্পা ভোট, ফলস ভোট, ভোটার তালিকায় গলদ এবং ভোট সন্ত্রাসের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল এই বাঙ্গলায় এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বেই। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই তা ফুলে ফেঁপে ওঠে। বামপন্থী এবং তৃণমূল কংগ্রেস শুধু তাদের অনুকরণই করেনি, বাড়িয়েছে অনেক বেশি মাত্রায়।

স্মরণাতীত কালের মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে সরাসরি সন্ত্রাসের কোনো ঘটনার খবর জানা যায় না। তবে ১৯৫৯-এর জুন মাসে জনৈক মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের চিঠিটিকে যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে একথা অনুমান করা বোধহয় ধৃষ্টতা হবে না যে, ১৯৫২ সাল এবং তার পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তি এবং রাজ্যের অনাবাসী ভোটারদের নামও যুক্ত করেছিল এবং কংগ্রেসের নিরবচ্ছিন্ন জয়ের পিছনে অবধারিতভাবে ভূমিকা ছিল ভুতুড়ে ভোটারদের।

তবে বেয়াদব এবং সৌজন্যবর্জিত



বাঙ্গলা এখনও সেই ঐতিহ্যেরই ধ্বজা বহন করে চলেছে আরও নির্লজ্জভাবে। ভোট সন্ত্রাসে কংগ্রেসকে অনুকরণ করেছিল বামফ্রন্ট ওরফে সিপিআই (এম)। সিপিআই (এম)-কে এখন অনুসরণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস সেই অতি পরিচিত প্রবাদবাক্যকে আপ্তবাক্য হিসেবে মেনে নিয়ে— মহাজনো গতঃ স পন্থা ইতি।

রাজনীতির প্রকোপ প্রথম দেখা গেল ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯-এর নির্বাচনে যখন কংগ্রেসকে হারিয়ে রাজ্যের প্রশাসনে এল যুক্তফ্রন্ট। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়কে সামনে খাড়া করে যা কিছু রাজনৈতিক কৌশল সবই করত কমিউনিস্টরা মূলত সিপিআই (এম)। সত্যিটা হলো— ভোটার তালিকায় গলদ সৃষ্টির কৌশলটা কংগ্রেসের কাছ থেকে শিখলেও সিপিআই (এম) সেটিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় সিপিআই (এম)-এর চরম আগ্রাসী আন্দোলন রাজ্যের বুকে গড়ে তোলে এক অদূরদর্শী রাজনীতি। ১৯৬৭-র নির্বাচনে তারই প্রকাশ ঘটল অসৌজন্যতার মাধ্যমে। অতুল্য ঘোষ এবং প্রফুলচন্দ্র সেনের মতো সজ্জন নেতাদের যুক্তফ্রন্ট ভূলুণ্ঠিত করল রাস্তার মোড়ে মোড়ে কাঁচাকলা ও কানা বেগুন ঝুলিয়ে। কারণ খাদ্য আন্দোলনের সময় প্রফুল্ল সেন পরামর্শ দিয়েছিলেন, চালের অভাব, তাই কাঁচকলা খান, পুষ্টিগুণ একই। আর রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ একটি চোখ ছিল অন্ধ। এ ধরনের অসৌজন্যের রাজনীতি এর আগে দেখা যায়নি। হয়তো তারই বৃহত্তর প্রকাশ দেখা গেল ১৯৭১-এ যখন ১৯৬৯-এর নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরিয়ে রাজ্যপাল ধরমবীর রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পিডিএফ দলনেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী করলেন সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এবং সিপিআই (এম) তার প্রতিশোধ তুলল রাজ্য বিধানসভায় প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে পচা ডিম, পচা টম্যাটো এবং দোয়াতের কালিতে কলঙ্কিত করে। এখান থেকেই সূত্রপাত। মাঝখানে ঘটে গেলে নকশালপন্থীদের উত্থান যাঁরা মনে করতেন, নির্বাচন পদ্ধতিটাই ভুল। অতএব খুন এবং সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ফের আসরে নামল কংগ্রেস সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে। ১৯৭২-র নির্বাচনে রাজ্যের কংগ্রেস কর্মীরা দেখিয়ে দিলেন, ভোটসন্ত্রাস কাকে বলে। শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের সর্বত্র ভোটের বুথগুলি থেকে ভোটকর্মীদের হটিয়ে দিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে অবাধে ছাপ্পা ভোট করেছিল কংগ্রেস। তার ফলে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল বিপুল ভোটে। এ ধরনের অবাধ ছাপ্পা এযাবৎ দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি বঙ্গবাসীর।

অবশ্যম্ভাবীভাবেই কংগ্রেস আর ফিরতে পারেনি ক্ষমতায় কখনই এককভাবে। ১৯৭৭-এই পাশা পালটে দিয়ে ক্ষমতায় পা রাখে বামফ্রন্ট। নেতৃত্বে সিপিআইএমের অবিসংবাদী নেতা জ্যোতি বসু। টানা ৩৪ বছর ধরে বাঙ্গলা দেখেছে--- ভোটসন্ত্রাস কাকে বলে। না, কংগ্রেসের মতো বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট করার মতো বোকামি বামফ্রন্ট বিশেষ একটা করেনি। কিন্তু গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় লাল পতাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করে রেখেছিল— ভোটটা বামপ্রার্থীকেই দিতে হবে। না হলে গ্রামছাড়া পাড়াছাড়া হতে হবে। বামফ্রন্টের আমলেই প্রথম দেখা যায় যে কোথাও কোথাও ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে এবং সব ভোটটাই পেয়েছেন বামপ্রার্থী। এও সম্ভব! অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিল বামদলগুলির ভোটলুটেরা কর্মীবাহিনী যারা বছরভর লাল দলের শাসন অপ্রতিহত রেখেছিল কখনও রক্তচক্ষু দেখিয়ে, কখনও বা সাইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে।

বাঙ্গলা এখনও সেই ঐতিহ্যেরই ধ্বজা বহন করে চলেছে আরও নির্লজ্জভাবে। ভোট সন্ত্রাসে কংগ্রেসকে অনুকরণ করেছিল বামফ্রন্ট ওরফে সিপিআই (এম)। সিপিআই (এম)-কে এখন অনুসরণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস সেই অতি পরিচিত প্রবাদবাক্যকে আপ্তবাক্য হিসেবে মেনে নিয়ে— মহাজনো গতঃ স পন্থা ইতি। মহাজনের পথই পথ। ভোটার তালিকায় গোঁজামিল এখন আর সম্ভব নয়। কিন্তু বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, বিরোধীদের প্রার্থীপদ জমা না দিতে দেওয়া, বিরোধীদের নির্বাচনী সভা করতে অনুমতি না দেওয়া এবং সরাসরি বুথের সামনে গিয়ে তর্জনী তুলে শাসানো, লাঠি, বোমা, পিস্তল নিয়ে বিরোধীদের ওপর আক্রমণের মতো ভোটসন্ত্রাস— তৃণমূল কংগ্রেসের মতো এত নির্লজ্জভাবে কোনো রাজনৈতিক দলই করেনি।



“রাজনৈতিক দলগুলি যারা ভোট-সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, তারা হয়তো এবার বুঝতে পারবে— গণতন্ত্রের শক্তি জনগণের সমর্থন।”

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন, ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচন— তিনটি নির্বাচনেই শাসক দল শুধু নয়, সরকারি প্রশাসন সরাসরি নেমেছে ভোটসন্ত্রাসে এবং সর্বত্র যে অনাবিল এবং অবিরাম সন্ত্রাস হয়ে গেছে, তার প্রতিবাদ করেননি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়— এই সন্ত্রাসে তাঁরও মদত আছে, বিশেষ করে তাঁরই ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবারে ভোট-পূর্ববর্তী সন্ত্রাস যখন সবচেয়ে বেশি যেখানে বাম প্রার্থী ডাঃ ফুয়াদ হালিমকে বারবার তিনবার তৃণমূল কংগ্রেসের আক্রমণের শিকার হতে হয়।

বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে পালটা মার দেবার মতো কোনও রাজনৈতিক শক্তি বাঙ্গলার বুকে ছিল না। কিন্তু এখন বিজেপি এসেছে অনেক বেশি শক্তিধর হয়ে। মানুষ সাহস পেয়েছে। শাসক দল ভোট দিতে বাধা দিলে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়েছে। রক্তপাত ঘটেছে। মাথা ফেটেছে। হাত ভেঙেছে। পাঁজর ভেঙেছে কিন্তু প্রতিবাদের পতাকাটা মাথা নত করেনি। হয়তো এখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জন্ম নেবে রাজনৈতিক চেতনার নব বোধোদয়। রাজনৈতিক দলগুলি যারা ভোট-সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করেই ক্ষমতায় টিকেছিল কিংবা টিকে থাকতে চায়, তারা হয়তো এবার বুঝতে পারবে--- গণতন্ত্রের শক্তি জনগণের সমর্থন। পয়সা দিয়ে কেনা গুন্ডাবাহিনীর রক্তচক্ষু নয়। গণতন্ত্র মানে জনগণের ভালোবাসা। কোনও রাজনৈতিক দলেরই কুম্ভীরাশ্রু সেই ভালোবাসায় ভাগ বসাতে পারে না যতক্ষণ না কোনও দল জনগণের দল হয়ে উঠতে পারে। ■



ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরে মূর্তিমান আতঙ্কের আরেক নাম সাধ্বী প্রজ্ঞা

সাধন কুমার পাল

সিপিএম, কংগ্রেসের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি যে শক্তের ভক্ত নরমের যম তা আরও একবার প্রমাণ হলো। ইসলামিক জেহাদিরা বিশ্বজুড়ে যত ভয়ংকর হত্যালীলা চালাক না কেন সিপিএম বা কংগ্রেসের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দল কখনই এই নিয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। কিন্তু 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' আদর্শের অনুসারী হিন্দুদের নিয়ে এদের মুখে নানা ফুলঝুড়ি ছুটতে থাকে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি শুনলে এরা নির্লিপ্ত থাকেন, জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে এরা অস্বস্তিবোধ করেন, তেড়ে যান, পুলিশ ডাকেন। গত ৩ মে বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে এক সভায় সিপিএম মহাসচিব সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, 'রামায়ণ ও মহাভারতের মতো ধর্মগ্রন্থে হিংসার ঘটনার কোটি কোটি উদাহরণ আছে।" ইয়েচুরির আরও বক্তব্য, 'আর এস এস প্রচারকেরা একদিকে এই গ্রন্থগুলোর উদাহরণ দেয়, অন্যদিকে দিকে আবার তাঁরাই বলে, হিন্দুরা হিংস্র হতে পারে না। এই কথার মধ্যে কি লজিক আছে যে, এক বিশেষ ধর্মের মানুষেরাই শুধু হিংসা ছড়ায়...। আর এস এস তাঁদের প্রাইভেট আর্মি বানাচ্ছে।"

হিন্দুদের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে ধর্মপ্রচার কিংবা নরহত্যার মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তারের কোনও রকম দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়ে সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি রামায়ণ-মহাভারতের মতো মানবতার আদর্শবাহী বিশ্ব ঐতিহ্যের অঙ্গ কালজয়ী গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ করে হিন্দুদের হিংস্রতার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। মনে রাখতে হবে, এই গ্রন্থ দুটি কোনও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়। এ গুলি ভারতের সম্পদ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর গর্ব ও অহংকার। এই গ্রন্থ দুটিকে ছোটো করা মানে ভারতাত্মাকে অপমান করা। রামায়ণে বর্ণিত রামরাজ্য ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশ কালের সীমা উত্তীর্ণ এক আদর্শ রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা। সেজন্য রামরাজ্যের কথা বলতেন গান্ধীজীর মুখে। এই গ্রন্থ দুটিতে বেধে দেওয়া সুর 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' সীতারাম ইয়েচুরিদের চোখে হিংসা।

সীতারাম ইয়েচুরির এই হিংসা তত্ত্বের মাইন্ডসেট বুঝতে হলে যোশেফ স্তালিনের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ভিত্তি কী, প্রশ্ন করা হয়েছিল যোশেফ স্তালিনকে। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন 'Intense hatred is the basis of our work'। অর্থাৎ তীব্র ঘৃণাই তাদের কাজের ভিত্তি। ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত 'দ্য ব্ল্যাক বুক অব কমিউনিজম : ক্রাইমস, টেরর, রিপ্রেশন'- এ দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে এই বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে ৯৪ মিলিয়নেরও বেশি নির্দোষ মানুষকে খুন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাম জমানায় অধিকাংশ রাজনৈতিক খুন নথিভুক্ত হয়নি। একটি বিশ্লেষণ (Mainstream weekly Vol. XLVIII no-34 August 14, 2010) বলছে ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ হাজার মানুষ খুন হয়েছে। বিজন সেতুতে প্রকাশ্য দিবালোকে আনন্দমার্গ সন্ন্যাসীদের পুড়িয়ে মারার মতো হিংস্রতার নজির সৃষ্টি হয়েছিল বাম জমানায়। স্তালিন যা বলেছেন তা যে কথার কথা নয় তা এই পরিসংখ্যানেই প্রমাণিত। এহেন স্তালিনের চেলারা পুরাণের দেবাসুর লড়াই, রামায়ণ মহাভারতের ধর্মরক্ষার লড়াইয়ের মধ্যেও যে হিংসার তত্ত্ব খুঁজে পাবেন এই বিষয়ে আর অবাক হওয়ার কী আছে। বিশ্বের নানা দেশে দাপিয়ে বেড়ানোর ইতিহাস থাকলেও ইসলামিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দাঁত ফোটানোর দৃষ্টান্ত নেই। চীন রাশিয়ার



লেজুরবৃত্তির লক্ষ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ভারতের মাটিতে প্রায় একশো বছর ধরে কোনোরকমে টিকে থাকলেও দেশভাগের সময় পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করা সত্ত্বেও ওই দেশে কিংবা বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রবেশের হিম্মত হয়নি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রামায়ণ- মহাভারতের মতো ধর্মগ্রন্থ থেকে হিন্দুরা অহিংসা ও পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা পায় বলেই সীতারাম ইয়েচুরিদের মতো চীন-রাশিয়ার দালালরা এদেশে রাজনীতি করার, হিংসা ছড়ানোর এবং জেহাদি ভোটের লোভে হিন্দুদের গাল দেওয়ার সুযোগ পান। শুধু কমিউনিস্টরা নয়, হিংস্রতার বিচারে কংগ্রেস দলও কম যায় না। শুধু মাত্র ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গাতে কংগ্রেস নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সরকারি হিসেবে ২৮০০ জন এবং বেসরকারি হিসেবে ৮০০০-১৭০০০ শিখ সম্প্রদায়ের নির্দোষ মানুষকে নিঃশংস ভাবে খুন করা হয়েছিল। এখন হিন্দুরা জাগছে। ফলে এখন যা প্রবণতা তৈরি হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে এখন যারা জেহাদি ভোটের লোভে হিন্দু সমাজের গায়ে হিংস্র কিংবা সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগানোর প্রয়াস করবে কালপ্রবাহে তাদের স্থান হবে ভারতীয় রাজনীতির জাদুঘরে।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে রাজস্থানের জয়পুরে এক জনসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে সর্বপ্রথম হিন্দু সন্ত্রাসের কথা বলে আরএসএস-সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনকে জড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। সাংবাদিকরা চেপে ধরলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন তিনি আসলে 'হিন্দু সন্ত্রাস' নয় 'গৈরিক সন্ত্রাসের' কথা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ একটি ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আর একটি ভুল।

শুধু আর এস এস, বিজেপি নয় এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিল ইউপিএ-র শরিক দল এন সি পিও। মায়াবতী তো সরাসরি বলেছিলেন ধর্ম হিসেবে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়ানোতে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র রোষের সঞ্চার হয়েছে। সে সময় মওকা বুঝে লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী হাফিজ সৈয়দ সিন্ধের বক্তব্য সমর্থন করে পাকিস্তানের যাবতীয় সন্ত্রাস ঘটনার দায় ভারতীয় সংগঠনগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে ভারতকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ঘোষণার দাবি জানিয়েছিল।

সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রসচিবের বক্তব্য অনুসারে হিন্দু সন্ত্রাসের ব্যাপারে নাকি তথ্য প্রমাণ তাদের কাছে ছিল। কিন্তু তথাকথিত 'হিন্দু সন্ত্রাস' তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) হয়ে কর্মরত গোয়েন্দারা তখন বলেছিলেন সমঝোতা এক্সপ্রেস (ফেব্রুয়ারি ২০০৭), মক্কা মসজিদ (মে ২০০৭), আজমির শরিফ (অক্টোবর ২০০৭) বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্তদের আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ থাকলেও আদালতে তা প্রমাণ করা কঠিন। এই তদন্ত আধকারিকদের আরও বক্তব্য এই সমস্ত ঘটনায় যত জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে তার বেশির ভাগটাই ছিল ওদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। এই সমস্ত প্রমাণ কতটা আদালতে গ্রাহ্য হবে তা নিয়েও ওই সময় গোয়েন্দারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ সমঝোতা এক্সপ্রেস ও মক্কা মসজিদ হামলায় অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ তদন্ত চলাকালীন রাষ্ট্রপতিকে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছিলেন যে ওঁকে এত ভয়ংকর অত্যাচার করা হয়েছে যে বাঁচার তাগিদে তদন্ত অফিসারদের বানানো বয়ানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছেন।

২০০৮ সালে মালেগাঁও বিস্ফোরণে ৬ জন মারা গিয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন ১০১ জন। জঙ্গি হামলা ঘটানো এবং তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে মালেগাঁও বিস্ফোরণের দায় জোর করে সাধ্বী প্রজ্ঞাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেই সময়ে সরকার হিন্দুত্বকে টার্গেট করেছিল। মালেগাঁও বিস্ফোরণ মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য ঘটানো হয়, এই কথাও কবুল করানোর চেষ্টা হয়েছিল। জেলে তাঁর উপর হওয়া অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে প্রজ্ঞা ঠাকুর বিভিন্ন সময় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তাঁর দাবি, জেলে তাঁকে টানা ২৪ দিন মারধর করা হয়। তাঁকে জলছাড়া আর কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি। মারধেরের সময় গালিগালাজ করা হতো। বেল্ট দিয়ে মারা হত। উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হতো। পোশাক খুলে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো।

তাঁর দাবি, শুধু মারধর করে ছেড়ে দেওয়া হতো না। মারের জোরে তাঁর সারা শরীরে দাগ হয়ে যেতো, রক্ত বেরোত। তখন নুন জল গরম করে এনে তাতে হাত ডুবিয়ে দেওয়া হতো। কিছুক্ষণ পর ফের মারধর করা হতো। এভাবে মারধরের জেরে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিনি হাসপাতালের বেডে এপাশ-ওপাশও করতে পারতেন না বলে দাবি করেছেন সাধ্বী প্রজ্ঞা। মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রজ্ঞার উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার কোনো নজির নেই। আজমল কসাভের মতো ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদীর উপরও এমন অত্যাচারের নজির নেই।

মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত প্রজ্ঞা ঠাকুর এখন জামিনে মুক্ত। এবার ভোপালে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুর বলে ফেলেন 'আমার অভিশাপেই মরেছেন পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারে'। ব্যস আর যায় কোথায়, হিন্দু সন্ত্রাস তত্ত্বের প্রবক্তারা শহিদের অপমান বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে হইচই বাধানোর চেষ্টা হলো। এদিনই বিজেপি জানিয়ে দিল ওই মত সাধ্বী প্রজ্ঞার 'ব্যক্তিগত'। জেলে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন বলেই সম্ভবত সাধ্বী ওই মন্তব্য করে ফেলেছেন।

মুম্বই পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখার অফিসার হেমন্ত কারকারে সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা চান বিজেপির নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর এবং বলেন, 'আমার মন্তব্যে যদি শত্রুরা খুশি হয়ে থাকে, তাহলে ওই কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি ক্ষমাও চাইছি। দেশের শত্রুরা খুশি হয়, এমন মন্তব্য করা উচিত নয়। আমি যা অত্যাচার সহ্য করেছি, তার প্রতিকার করা যাবে না। কিন্তু হেমন্ত কারকারে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মারা গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি শহিদ'। ■

ওড়িশায় ফানি আক্রান্তদের পাশে স্বয়ংসেবকরা

গত ৪ মে ঘূর্ণিঝড় ফানির প্রকোপে ওড়িশার পুরী, কেন্দ্রপাড়া, খুর্দা, জগৎসিংহপুর,জাজপুর জেলার জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ৩ মে ঝড়ের সরকারি সতর্কবার্তা পেয়েই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন ঝুপড়ি থেকে চারশোর বেশি লোককে নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করেন। উৎকল বিপন্ন সহায়তা সমিতির কার্যকর্তারা এবং সঙ্ঘের স্বংসেবকরা ঝড়ের মধ্যেই উদ্ধার



কাজে নেমে পড়েন। প্রভাবিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছনোর জন্য ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। ত্রাণ কাজের জন্য ৭টি কেন্দ্র খালা হয়— ঘোড়াবাজার শিশুমন্দির পুরী, সরস্বতী শিশুমন্দির ব্রহ্মগিরি, দণ্ডমুলুকুণ্ডাপুর, চাঁদপুর, নিমাপাড়া এবং ইউনিট-৩ সরস্বতী শিশুমন্দির ভুবনেশ্বর। এছাড়া জগৎসিংহপুর ও কটকেও কেন্দ্র খোলা হয়। প্রথমদিনেই ১৯ কুইন্টাল চিড়া, ৫ কুইন্টাল গুড়, পলিথিন, মোমবাতি, দেশলাই এবং ১০ লক্ষ জলের বোতল বিতরণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ ভাগাইয়াজী সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

দিল্লিতে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষের শুভ সন্ধ্যায় দিল্লির প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের উদ্যোগে করোল বাগের আর্য সমাজ মন্দিরে বাংলা নববর্ষ-১৪২৬ বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পুরুষ ও মহিলা সহ ৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের সভাপতি অসিতাভ ভৌমিক বলেন, হিন্দু বাঙ্গালিরা সতর্ক না হলে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো একই পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। এখনও সময় আছে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর। নর্থ এমসিডি-র অবসরপ্রাপ্ত মেয়র রবীন্দ্র গুপ্ত বলেন, কয়েক লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালি বহু বছর ধরে দিল্লিতে বসবাস করছেন, কিন্তু বাংলা বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এই প্রথম। আমি অভিভূত। আপনারা আমার ভাই। প্রতি বছর বাংলা বর্ষবরণের মাধ্যমে সমাজে সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরতে হবে। এজন্য আমি আপনাদের পাশে সবসময় আছি ও থাকবো। প্রধান অতিথি র ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা বলেন, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকতে হবে। এতো দূরে থেকেও বাংলা বর্ষবরণের মতো অনুষ্ঠান আমরা করতে পারছি কারণ আমরা সঙ্ঘবদ্ধ। বিশেষ অতিথি ধর্ম জাগরণ মঞ্চের অশোক কুমার ভোলা বঙ্গাব্দের ইতিহাস সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন ড. অর্ণব ভট্টাচার্য, দীপক ভট্টাচার্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদর সুরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, ড. দেবজিৎ ঝা, পদ্মনাভ লাহিড়ী, সাগর চৌধুরী প্রমুখ।

সংস্কার ভারতীর বসুন্ধরা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২২ এপ্রিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবসটিকে সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সমস্ত শাখা বসুন্ধরা দিবস হিসেবে পালন করে। গোবরডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ, সোনারপুর, বাগুইআটি শাখা ঐতিহ্য প্রাঙ্গণে ভূ-অলংকরণ ও প্রকৃতি পর্যায়ের গানের মাধ্যমে বসুন্ধরা বন্দনা করে। কলকাতা শাখাও শিশুকিশোর মঞ্চ, উত্তরপাড়া, বাগনান, বীরশিবপুর, বেহালা, দক্ষিণ কলকাতা, মেদিনীপুর নগর, দেশবন্ধু নগর, বর্ধমান, বাঁশদ্রোণী, পলাশী, বারুইপুর, সিউড়ি শাখা শোভাযাত্রা, বৃক্ষে জলসিঞ্চন, পুষ্পআলপনা ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বসুন্ধরা বন্দনা করে।

কলকাতা সাহিত্য অ্যাকাডেমির গল্পপাঠ

গত ৭ মে কলকাতার সাহিত্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে তাদের সভাকক্ষে বহুভাষিক লেখিকাদের 'অস্মিতা' নামে এক গল্পপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তিনজন লেখিকা তাঁদের গল্প পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে ড. দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং লেখিকাদের সঙ্গে সকলের পরিচয় করান। অসমীয় লেখিকা রুমি লস্কর বোরা, বাঙ্গালি লেখিকা মৌমিতা এবং হিন্দি লেখিকা অলকা সারোগী তাঁদের গল্প পাঠ করেন।

শ্রীমতী বোরা 'আস্তানের সারাও' গল্পে বিভিন্ন পরিবহণ সংস্থা এবং সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত দালালদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীমতী মৌমিতা তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া নূপুরটা' গল্পে কিশোর প্রেমের কথা তুলে ধরেন। শ্রীমতী সারোগী তাঁর 'কুলভূষণ' গল্পে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত অভিবাসীদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের টানাপোড়েনের কথা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন অ্যাকাডেমির বাংলা উপদেষ্টা পর্ষদের আহ্বায়ক ড. সুবোধ সরকার। ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন সাহিত্য অ্যাকাডেমির পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়ের কর্মসূচি আধিকারিক ড. মিহির কুমার সাহু। ■



আমায়নের কথা অমৃত সমান

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ফলের রাজা আম। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ফলের মধ্যে আম সকলের সেরা। অন্যান্য সব ফল থেকেই আমের গঠন, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, খাদ্যগুণ, বিভিন্ন জাত ইত্যাদি সব কিছুতেই উৎকৃষ্টতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জন্যই একে ফলের রাজা উপাধি দেওয়া হয়েছে।

ফল হিসেবে এদেশে আমের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতে আম শুধু একটি ফল নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে আম ভারতীয় জনজীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে। আমের পল্লব একটি অপরিহার্য সামগ্রী। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রবেশদ্বার আজও সাজানো হয় সহকার শাখা আর পত্রপুঞ্জের বিন্যাসে। আমকাঠ দরকার হয় যজ্ঞ ও হোমাদিতে। মুকুলের প্রয়োজন সরস্বতী পূজায় ও শিবরাত্রির অনুষ্ঠানে। প্রাচীন ভারতে আমের প্রমাণ মেলে রামায়ণে, মহাভারতে, শিল্পে, ভাস্কর্যে ও ইতিহাসের পাতায়।

পাণিনির রচনায় 'আম্রগুপ্ত' এবং 'আম্রপূরা' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক নানা কাহিনিতে আম সম্পর্কিত বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যেমন— আম্রপাল নামে এক নৃপতি ও আম্রপালি নামে এক রাজসভাসদের নাম পাওয়া যায়। আম্র গন্ধক, আম্রনিশা, আম্রগন্ধীহরিদ্রা নামে ভেষজের নামকরণ করা হয়েছে। প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনঙ্গদেবের অস্ত্র হিসেবে আমের উল্লেখ রয়েছে কালিদাসের কাব্যে। বৌদ্ধ যুগে অমর সিংহের রচনা 'অমর কোষ'-এ আমের যশোগান শোনা যায়। সাঁচী বৌদ্ধস্তূপে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ বছরের স্থাপত্যে আমগাছ দেখা যায়।

সপ্তম শতাব্দীতে চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এদেশে এসে মথুরায় সবুজ, হলুদ বর্ণের ফলময় বিশাল আম্রকুঞ্জ দেখে চমকে উঠেছিলেন। সেই ফল খাওয়ার পর তিনি মুগ্ধ হয়ে আমকে ফলের রাজা উপাধি দিয়েছিলেন এবং এদেশ থেকে ফেরার সময় কিছু আম তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। হিউয়েন সাং ১৩ বছর ভারতে ছিলেন। তিনি তাঁর 'আন-খো-লো' ভ্রমণ বৃত্তান্তে আম সংক্রান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

ফাহিয়েনের বর্ণনায় রয়েছে, গৌতম বুদ্ধকে গোটা একটা আমের বাগান উপহার দিয়েছিলেন 'আম্রধারিকা' নাম্নী এক গণিকা। বুদ্ধ সেই বাগানে এসে মাঝে মধ্যেই ধ্যানমগ্ন হতেন।

সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বাগদাদের খলিফারা আমের স্বাদ নিতেন বাদশাহি সুরার রসে। আমের রস তাদের খানদানি মহলের পৃথক ঘরে ৬ মাস ধরে রাখা হতো। সেই শুকনো ও পচন ধরা আম থেকে তৈরি হতো সুরা। এই খলিফাদের মাধ্যমে আম মাহাত্ম্য পারস্য হয়ে মিশরে পৌঁছয় ১০০০ খ্রিস্টাব্দে। ইবন বতুতা আমের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ।

আমের কথা খনার বচনেও আছে। যেমন— 'আসে ধান, তেঁতুলে বান'। রামায়ণের পাদটিকায় আমের নাম আছে। রাম তখন বনবাসে। অযোধ্যা ছেড়ে মিথিলা হয়ে যেতে চান অঙ্গদেশ। রাস্তার মাঝে পড়ে সেকালের পঞ্জুদেশ মালদহ। মালদহ ভূখণ্ডের নদী মহানন্দার উত্তরে তালভূমি ধামে ছিল হনুমানের নিবাস। হনুমানই রাম, সীতা, লক্ষ্মণকে টানতে টানতে আম খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন কালিন্দী নদীতীরের এক আম বাগানে। আমের স্বাদে গন্ধে 'মত্ত' হয়ে রামচন্দ্র সেখানে ফলকেলি করেন। আমের আকার আয়তন দেখে থ বনে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র। সেইসব পেল্লাই সাইজের আম নাকি ছিল আজকের ফজলি। রামের সেই ফজলি কেলির পর ওই আম অরণ্যের নাম হয়ে যায় রামকেলি।

মোগল সম্রাট বাবরের কাছে আম এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে তিনি আমকে 'গৌর-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। রাজা-মহারাজা, অট্টালিকাবাসী থেকে পর্ণকুটিরবাসী সবারই প্রিয় এই আম। আধুনিক

যুগেও বিভিন্ন মনীষীর লেখা ও বক্তব্যে আম মাহাত্ম্য জানা যায়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গেছেন, 'আম একা খাইতে নাই। ইষ্টদেবতাকে দিয়া, ব্রাহ্মণ-সজ্জন, পল্লীর প্রতিবেশীর সকলকে এবং কাঙাল ফকির সকলকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া তবে নিজ পরিবারবর্গ সহ আম খাইতে হয়।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আম খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। বলতেন, 'সকল ফল ডালে, আম খাবে পালে'। চাকরি প্রার্থী হয়ে আসতেন যাঁরা, বিদ্যাসাগর তাঁদের পর্যন্ত নিজ হাতে আম কেটে খাওয়াতেন। 'একবার এ আঁবের এক চাকলা, পরের বার বলতেন এবার ও আঁবের একটা চাকলা খাও তবেই না বুঝবে আমাকে কেন ফলের রাজা বলা হয়।'

মহানায়ক উত্তমকুমারও আম খেতে খুব ভালোবাসতেন। আরও জানা গেছে— সময়-সুযোগ পেলে ওড়নায় মুখ ঢেকে নিউ মার্কেটে আম কিনতে যেতেন সুচিত্রা সেন।

পুষ্টিবিদরা বলেন— আমে ভিটামিন 'এ' এবং 'সি' পরিপূর্ণ। পটাশিয়াম আর বিটা ক্যারোটিন রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। মাত্র এক গ্রাম ফ্যাট। কোলেস্টোরেল নেই। প্রোটিন ০.৫ গ্রাম, ক্যাসিয়াম ২০.৭ মি.গ্রা., আয়রণ ০.৭৭ মি.গ্রা.। এছাড়া ভিটামিন বি.টু. সিক্স, ফসফরাস, কার্বোহাইড্রেট রয়েছে সুষম পরিমাণে। খাদ্যগুণে ভরপুর, আবার খেতেও সুস্বাদু। তাই এর নাম অমৃত ফল। আবার জাতীয় ফলের মর্যাদাও পেয়েছে।

আম শব্দের উৎপত্তি আম ধাতু থেকে। যার অর্থ যথেষ্ট, পর্যাপ্ত বা প্রচুর। আমের অনেক নাম। সংস্কৃতে বলা হয়— আম্র, আম্রশ্চুত, অতিসৌরভ, কামাঙ্গা, রসাল, মধুদূত, মাকন্দ, পিকবল্লম, সরস, মদিরাসখ, অঙ্গনাপ্রিয়, মৃষালোক, পিকবল্লভ, চ্যুত। এছাড়া আমকে বলা হয় সহকার, গন্ধবন্ধু, পিকপ্রিয়, অলিপ্রিয়, সাধুলী, বসন্তদূত, পিকরাগ, নৃপপ্রিয় ইত্যাদি। মরাঠি ভাষায় আমকে অম্বা, গুজরাটিতে আম্বো, তেলুগুতে ইয়ামিদিছেট্টু, কন্নড়ে বলে অংব।

কাঁচা আম কেটে রোদে শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয় সারা বছর ব্যবহার করার জন্য। একে বলা হয় আম্রপেশি বা আমসি। পাকা আমের রস রোদে শুকিয়ে আমসত্ত্ব বানানো হয়।

''আমসত্ত্ব দুধে ফেলি/তাহাতে কদলি দলি'' এ সোমধারার মতোই উপাদেয়।

চরক বলেছেন, ''আম্রং বলং রক্তপিত্ত পরম মধ্যাং তু পিত্তলম, পক্কং বর্ণকরং মাংস-শুক্রবল প্রদম''। অর্থাৎ কচি আম রক্ত-পিত্তকর, মধ্যবয়সের (ডাঁশা) আম পিত্তকর এবং পাকা আম বর্ণ, মাংস, শুক্র ও বলদান করে।

ভারতে প্রায় ১২০০ প্রজাতির আম আছে। তার মধ্যে আমের হিরোর নাম হিমসাগর। হিমসাগরের ঘাড়ের কাছেই নিঃশ্বাস ফেলছে গোপালভোগ, ল্যাংড়া। বঙ্গ ললনাদের যেমন নামের শেষ নেই তেমনি আমের নামেরও শেষ নেই। হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি, সুরমা ফজলি, কহিতুর, গোলাপখাস, বেগমখাস, গোপালভোগ, কিষেনভোগ, লক্ষ্মণভোগ, মোহনভোগ, দশেরি, লালদোফলা, বারমেষে, কাঁচামিঠা, ক্ষুদপাচন, চৌতা, আলফানসো, কালাপাহাড়, দিলসাদ, অনুপাম, রানী, রানীপসন্দ, মির্জাপসন্দ, নাজিমপসন্দ, সফদারপসন্দ, চম্পা, নীলম, ঝুমকা, বিসলি, সবুজা, রাগলি, আনানাস, মাদ্রাজি, মঞ্জিরা, মালগোড়া, রাজেন্দ্র, রামকেলা, সূবর্ণরেখা, আম্রপালী, মল্লিকা, সিন্ধু, নশ্বরটেন, মেখলণ্ঠন, ভাস্তারা, পুনাশা, পেতাসুইটস, সারদামনি, লালমোহন, রোখানিয়া, মোলায়েমজং, কোহিনুর, জি.আর.ফাইভ, জি.আর.নাইন এবং আরও আরও অনেক। এছাড়া সর্বশেষ শংকর প্রজাতির আমপুশা-অরুনিমা, যার অর্থ সূর্যের রক্তিম আভা।

আমের নামকরণের মধ্যেও মজার খবর পাওয়া যায়। যেমন— ল্যাংড়া : বিহারের হাজিপুরে এক খোঁড়া ফকির প্রতিদিন বেরোতেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। একবার এক মসজিদ এবং কাছেই থাকা মন্দির থেকে নানারকম ফল, পয়সা, চলে ভিক্ষা পেয়ে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন ভিক্ষার ঝুলিতে রয়েছে একটি গাছের চারা। সেটি তিনি উঠোনে লাগালেন। গাছ বড়ো হয়ে আম ধরল। পাটনার বিভাগীয় কমিশনার কোবর্ন সাহেব তদন্তে এসে গাছভর্তি আম দেখে খেতে চাইলেন। ফকিরের দেওয়া আম খেয়ে মুগ্ধ কমিশনার ওই আমের প্রশংসা করায় সেই আমের কদর বেড়ে গেল। সেই থেকে ফকিরের গাছের আমের নাম হলো ল্যাংড়া।

রানিপসন্দ : নবাব নিজামতের দেওয়ান রাজা প্রসন্ন নারায়ণ মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে এসে মুর্শিদাবাদের রইসবাগের একটি আম খেয়েছিলেন। সুস্বাদুর জন্য রাজা সেই আম ফেরার সময় নিয়েও গিয়েছিলেন। সেই আম খেয়ে রানি বলেছিলেন— ''খেলে এই আমই খাব, নচেৎ আম না খাওয়াই ভালো।'' প্রসন্ন নারায়ণ আমের নাম দিলেন রানিপসন্দ।

ফজলি : মালদহের এক গ্রামে ৭০ বছরের বুড়ির একমাত্র ছেলে রোজগার করতে গিয়ে আর আসে না। বুড়ি কান্নাকাটি করে আর সবাইকে বলে আমার ছেলে কোথায় গেল, তাকে এনে দাও। বুড়ির সন্তানের কথা শুনলেন নবাব হোসেন শাহ। বুড়ির কাছে সব শুনে বললেন, কাল আমার রাজসভায় এসো। পরেরদিন বুড়ি রাজসভায় এলে নবাব তার হাতে একটি আমের চারা দিয়ে বললেন, যেদিন এই গাছ বড়ো হয়ে আম ধরবে এবং আম সেদিন পাকবে সেদিন তোমার ছেলে ফিরে আসবে।

অন্তহীন প্রতীক্ষার পর গাছ বড়ো হয়ে ফল ধরল তাতে। বুড়ি রাজসভায় এসে নবাবকে বলল, গাছে আমতো এসেছে, ছেলে তো এল না? নবাব বললেন, কালই তোমার ছেলে এসে আম খাবে।

বুড়ির সারারাত ঘুম এল না। সাত সকালে লোক লস্কর নিয়ে নবাব এসে হাজির। কই হে মা, আম খাওয়াও। বুড়ির কথায় পাইক বরকন্দাজ গাছে উঠে আম পেড়ে অনলে নবাব সই সবাই সেই আম খেল। বুড়ির প্রশ্ন, আমার ছেলে কোথায়? নবাব তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমিই তোমার ছেলে। তুমি আমার কাছে থাকবে। কী নাম তোমার ছেলের? বুড়ির জবাব, ফজলু। নবাব ঘোষণা করলেন আজ থেকে এই আমের নাম ফজলি।

গোপালভোগ : পাণ্ডবদের তখন অজ্ঞাতবাস চলছে। অঙ্গদেশ, বর্তমান বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পণ্ডুদেশ অর্থাৎ এখনকার মালদহে এসেছিলেন তাঁরা। সেখানে পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কৃষ্ণসখা সুদামা। তাঁরই হাত দিয়ে গোপালের জন্য আম পাঠিয়েছিলেন পাণ্ডবেরা। তাই সেই আমের নাম হয় গোপালভোগ। এই কাহিনি শুনে দিনাজপুরের দুখী কবিয়াল 'আমগম্ভীরা' পালায় আলকাপের গান বেঁধেছিলেন— 'আম খ্যায়ে পাণ্ডবেরা খুশি মালদহে / আম হলো ফলরাজা পাণ্ডবেরা কহে।'

ভারতের মধ্যে আম উৎপাদনে এবং ব্যাবসায়ে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও রেকর্ডে সবার আগে। সবচেয়ে বড়ো আম মালদহের ফজলি, এক কিলোর ওপর ওজন হয়। আর সবচেয়ে ছোট্ট আম মুর্শিদাবাদের খুদপসন্দ। ২৫ গ্রামের বেশি ওজন হয় না।

■



জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টিধ্বনি ওঙ্কার

শুভেন্দু সরকার

প্রাচীন ভারতে হিন্দু ঋষিরা ঈশ্বরকে লাভ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু চিহ্নকে সাধনার মাধ্যম করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ওঙ্কার। অধ্যাত্মবিজ্ঞান জগতে ওঙ্কারের গুরুত্ব ও মহিমা অপরিসীম।

আত্মা থেকে পরমাত্মার মিলনের তথা ঈশ্বর দর্শনের একমাত্র প্রতীক। প্রজাপতি ব্রহ্মা ওঙ্কারকে অ-কার , উ-কার, এবং ম-কার এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এইজন্য তিন বেদের সার হলো 'ওঁ', তাই একে মাঙ্গলিক চিহ্ন বলা হয়।

'অ' থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি। 'উ' কার থেকে জগতের স্থিতি বা বিস্তার এবং 'ম' থেকে সৃষ্টির প্রলয়কে বোঝানো হয়েছে। এই তিনের সমন্বয়েই 'ওঁ' সৃষ্টি, যার দ্বারা পরমাত্মার অস্তিত্ব এবং তার শক্তি সম্পর্কে অনুভব করতে পারি।

'ওঁ'-এর মহিমা ভারতীয় সমস্ত ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। এর আর এক নাম প্রণব। সম্পূর্ণ বেদ 'ওঁ'-এর মহিমা প্রকাশ করে।

কঠোপনিষদে ধর্মরাজ নচিকেতাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলতে গিয়ে ওঙ্কারের মহিমা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

''সর্বে বেদা যৎ পদমানমনন্তি তপাংসি সর্বানি
চ যদ বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যা তরন্তি
তত্ত্বে পদ সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।।"

অর্থাৎ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই মানুষের সর্বশেষ প্রাপ্তব্য বলে যমরাজ পরব্রহ্মের বাচক 'ওঁ'কে প্রতীকস্বরূপ ঘোষণা করে তার স্বরূপ জানাচ্ছেন। তিনি বললেন যে, সকল বেদ বিভিন্ন প্রকারে নানা ছন্দে যার প্রতিপাদন করেন, সর্বপ্রকার তপস্যা এবং বিভিন্ন সাধনার যিনি পরম ও চরম লক্ষ্য তথা থাকে পাওয়ার ইচ্ছায় সাধক নিষ্ঠাপূর্বক ব্রহ্মচর্যের পালন করেন, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের পরমতত্ত্ব তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। তা হচ্ছে এক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ যা 'ওঁ'-এর রূপ। 'ওঁ' হলো পরব্রহ্মের প্রতীক।

সব নামের মধ্যেই 'ওঁ'কেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়েছে। অতএব নাম এবং নামিকে অভেদ জেনে 'প্রণব'কে পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তম বাচক শব্দ হিসেবে যমরাজ বর্ণনা করেছেন।

''এতদ্ধ্যেবাক্ষরা ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্
এতদ্ধ্যেবশেরং জ্ঞাতা যো যদিচ্ছতি যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।"
(কঠ: উপ:-১৬)

অর্থাৎ এই অবিনাশী প্রণব বা 'ওঁ'ই ব্রহ্ম এবং ইনিই পরব্রহ্ম পরমপুরুষ পুরুষোত্তম। এরই সাধনার দ্বারা সাধক যে কোনো অভিষ্ট রূপের সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। এইভাবে 'ওঁ'কে ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম এই দুইয়ের প্রতীক বলে নচিকেতাকে যমরাজ বুঝিয়েছেন। 'ওঁ' তথা প্রণবের উৎপত্তি অ+উ+ম এই তিন বর্ণ থেকে। প্রণবের লেখন— ঊর্ধ্বশুন্ত, মধ্যশুন্ত ও অধঃশুন্তের রূপে চন্দ্রকলা এবং বিন্দুর যোগে সৃষ্টি হয়েছে। এই শুন্তের প্রধান ভাগ হলো সোম, সূর্য ও অগ্নি— এই তিন মাত্রা বিরাজমান। সোমের একশো ছত্রিশ (১৩৬), সূর্যের একশো ষোল (১১৬) এবং অগ্নির একশো আট মাত্রা (১০৮)। মোট তিনশো ষাট মাত্রা (৩৬০) উপস্থিত। এই সংখ্যা এক বছরের (৩৬০) সময়ের সঙ্গে হিসেব করা হয়। সকল মন্ত্রের সেতু 'ওঁ'কেই বলা হয়। তাই মনোবাঞ্ছনার ফলের প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক মন্ত্র 'ওঁ'-এর সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

প্রণব অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সদাশিবের অধিষ্ঠান রয়েছে। প্রণব উদগীথ, আদিবীজ, বেদসার, মহানাদ ইতাদি নামে 'ওঁ' প্রসিদ্ধ। শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'ওঁ'কে ঈশ্বরের প্রতীক বলে মনে করা হয়েছে। গুরুনানকদের শিখধর্মের মূল মন্ত্রে বলেছেন—

''এক 'ওঁ' সতিচনামু করতা পুরখু
নিরভউ, নিরবৈরু, অকাল সুরতী অজুনী সৈভং।।" (গুরুপ্রসাদী)

অর্থাৎ এটাই সত্য যে 'ওঁ'ই হলো সেই একই পরমেশ্বর এবং তিনিই 'সতনাম' ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিনের তিনিই সৃষ্টিকর্তা। যিনি অজন্মা এবং অমর তার উপলব্ধি একমাত্র গুরুর কৃপার দ্বারাই সম্ভব।

'ওঁ' হলো সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মা স্বরূপের ব্যাক্ত করা এবং 'নাদ' ব্রহ্মের সূচক। জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি এই 'নাদ' থেকেই হয়েছে, তা ভারতের প্রাচীনকালের ঋষি থেকে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন।

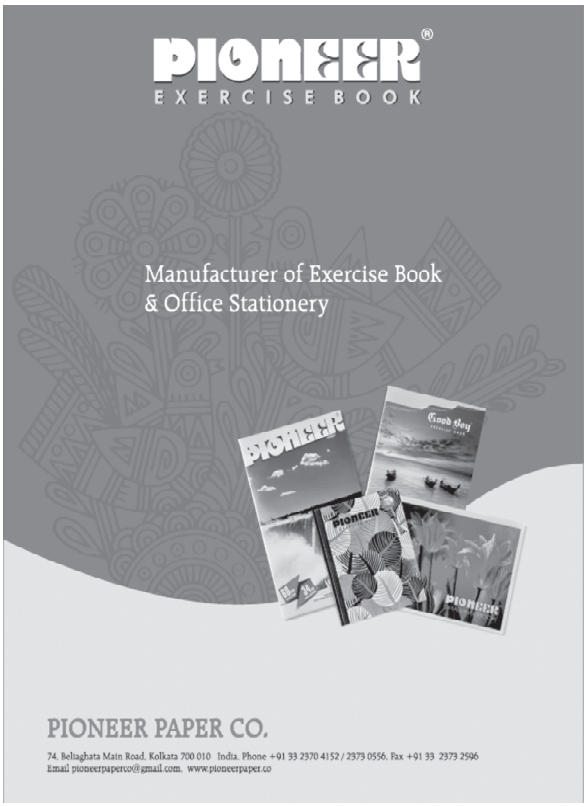
আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও স্বীকার করেছেন যে, ধ্বনির আধারেই এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। 'ওঁ' ধ্বনি যোগশাস্ত্রেও একটি বড়ো মাহাত্ম্য রয়েছে। দেহ ও মনের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা তথা ষট্‌চক্রের জাগানোর জন্য হটযোগে 'ওঁ'-এর মহিমা তুলনাহীন। যোগশাস্ত্রের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি 'ওঁ'কে ঈশ্বরের বোধক বলেছেন। যোগীরা 'ওঁ'-এর উচ্চারণ দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত প্লুতস্বরে করে থাকেন এর নাম উদগীথ। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

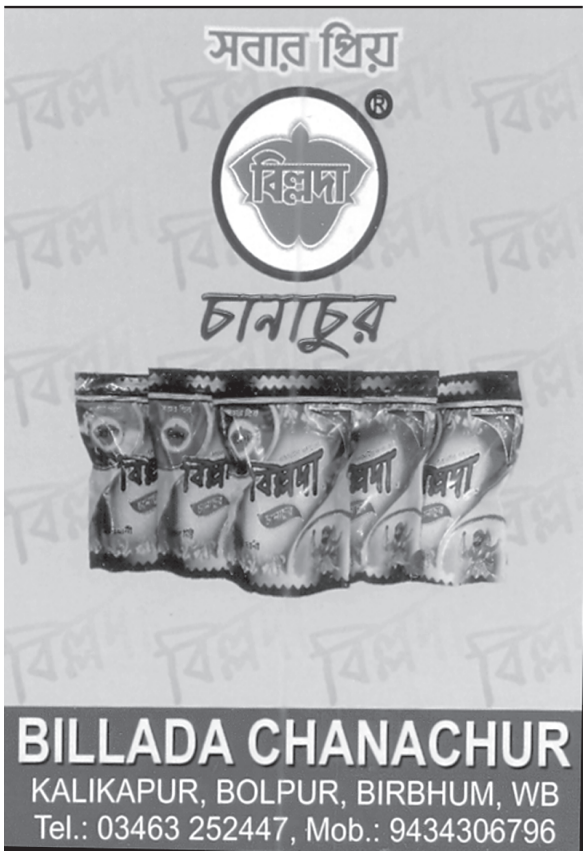
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচন

অনেক এগিয়ে বিজেপি, পিছিয়ে তৃণমূল

সনাতন রায়

সতেরোতম লোকসভা নির্বাচন সবে শেষ হয়েছে। এবং বলাই যেতে পারে, জনগণের রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। চূড়ান্ত হয়ে গেছে, এবার কোন দলকে সরকার গড়ার অধিকার দিলেন ভোটাররা। কাকে নির্বাচিত করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই যখন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে চলছে হাজারো সমীক্ষার কাটাছেঁড়া, তেমনি একটা সময়ে কিন্তু গোটা দেশবাসী তাকিয়ে আছেন পশ্চিমবঙ্গের দিকে। কারণ এবার ভোটে গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজরকাড়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গই। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সংবিধান বিরোধী কেন্দ্র বিরোধিতা এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় তথা বঙ্গসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর সঙ্গে দ্বৈরথের চাপান-উতোর নিঃসন্দেহে এবারের লোকসভা ভোটে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। এমনকী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও পশ্চিমবঙ্গ অসীম গুরুত্ব পাচ্ছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফল এবার সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা বিজেপির কাছে। এই ফলাফল আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আরও একটি কারণে। কারণটি হলো, একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত হারবেন জেনেও মোদীজীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন 'নিজেকে বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রীর মুখ' হিসেবে ঘোষণা করে। রাজ্যের ৪২টি আসনের ফলাফল এবার তাই বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম স্লোগান তোলেন— ২০১৯ বিজেপি ফিনিশ এবং এই স্লোগান তুলেই তিনি ব্রিগেডের মঞ্চে বিরোধীদের গঠবন্ধন গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যে প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই বানচাল হয়ে গেলেও, তিনি মনে করছেন, রাজ্যে তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় স্তরে সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এরকম পরিস্থিতিতে এ তাবৎ সম্পূর্ণ হওয়া লোকসভা কেন্দ্রগুলির ফলাফল কী হতে পারে সে সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণ জরুরি। এমনকী শেষ পর্যায়ের ফলাফল হবে কেমন তারও একটা অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে দেখে নেওয়া দরকার— কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্য লোকসভা নির্বাচনের সম্মুখীন এবং ভোটের লড়াইয়ে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি কোন কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

রাজ্যে শাসক দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের ইতিমধ্যেই ৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং বলা যেতে পারে মাত্র ৮ বছরেই দলকে বইতে হচ্ছে 'সরকার বিরোধী এবং দলবিরোধী' অভিযোগের পাহাড়-প্রমাণ বোঝা। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের জমানায় অভিযোগের রাশ যতটা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অভিযোগে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস। উন্নয়নের দোহাই আর মা মাটি মানুষের স্লোগান দিয়ে মমতা

শতাংশের হিসেবে এবার ভোটে ছক্কা মারবে বিজেপি তা নিঃসন্দেহ। আর এবারের ফলাফল প্রমাণ করবে— পশ্চিমবঙ্গে দিদির ঔদ্ধত্যের যবনিকার সময় এগিয়ে এসেছে। মোদীজীর সুযোগ্য নেতৃত্বে যে নতুন ভারত গড়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ হবেন সেই উদ্যোগের নয়া শরিক।

বন্দ্যোপাধ্যায় যতই চেষ্টা করুন না বাঙ্গলার জনগণের 'ঘরের মেয়ে' ইমেজটাকে ধরে রাখার, এবার তা বেশ কঠিন। কারণ তিনি নিজেই সরকারের প্রধান এবং দলের প্রধান হিসেবে সরকার ও দলের কাছেই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এখন তাঁর ভূমিকা সেই মূর্খ কালিদাসের মতোই যিনি যে ডালে বসেছিলেন, সেই ডালটিই কর্তন করেছিলেন একথা না ভেবেই যে নিজের পায়ে কুড়ুল মারাটা শুধু রক্তপাতই ঘটায় না, নিজেকেই পঙ্গু করে দেয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল ও সরকার এখন সেই পঙ্গুত্বের পর্যায়ে।

ইতিমধ্যে আরএসএস এবং বিজেপির টানা প্রচেষ্টায় অন্যান্য রাজ্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুভোট অনেক বেশি সংগঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের ঝড়ের মুখে নিজেকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছে। এর ফলে একদিকে যেমন কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট পায়ের তলার মাটি হারিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ভোট এগিয়েছে মেরুকরণের পথে। বলা যেতে পারে দু'পক্ষই এখন মুখোমুখি লড়াইয়ের ময়দানে। সেই 'ডুয়েট'-এর মত। বিজেপির শক্তি সঞ্চয় মানেই তৃণমূলের শক্তিক্ষয়। এর মূল কারণ তৃমমূলের মূল ভোটব্যাঙ্ক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট— সেখানেই চিড় ধরাতে পেরেছে বিজেপি। বিজেপির অবিরাম বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের হুমকি একদিকে যখন হিন্দু ভোটকে একজোট করেছে দেশের এবং রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে, তেমনি মুসলমান ভোট অস্তিত্বের সংকটের কারণে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। এদেশি বৈধ মুসলমানরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে তৃণমূলের আঁচল ধরা ছেড়ে বিজেপির গেরুয়া রঙে মেতেছে বহু জেলায়।

এর কারণ হলো, মালদা বা মুর্শিদাবাদের মতো বহু জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তৃণমূলের গুন্ডাগিরির শিকার হচ্ছেন। মারছেনও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, মরেছেও মুসলমান। তার ওপরে আছে সরকারের আর্থিক অনুদান দিয়ে মুসলমান সমাজের মূল প্রয়োজন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যাওয়ার সরকারি প্রবণতা। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু যেমন প্রতিদিন 'বীতশ্রদ্ধ' হয়ে উঠছে, তেমনই হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। মুসলমানরাও বুঝছেন এর জন্য দায়ী রাজ্য সরকার এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি তথা মোদীজীকে যতই গণতন্ত্রের ফাঁসুড়ে বলে আখ্যা দিন না কেন, রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছেন সততার প্রতিমূর্তি নিজেই এখন রাজ্যে তথা গোটা দেশের গণতন্ত্রের সামনে সবচেয়ে বড়ো বিপদ। কারণ তিনি যখন একদিকে বিজেপির ঘাড়ে জনগণকে ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজনের দায় চাপাচ্ছেন, তখন তিনি নিজেই সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন। কারণ, এরাজ্যে মতুয়াদের নিয়ে তিনিই প্রথম রাজনীতি শুরু করেন। ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি কার্যকর করতে গিয়ে দার্জিলিঙে বিভাজন করেছেন পাহাড়ি মানুষগুলিকে গোষ্ঠীগত বোর্ড গঠন করে— যেমন গোর্খা বোর্ড, ভুটিয়া বোড, লেপচা বোর্ড ইত্যাদি। এর ফলে সেখানে এখন যা চলছে তা গৃহযুদ্ধেরই নামান্তর। ২০১১ সালের পর তৃণমূল কোনো ভোটেই মানুষের ভোটে জেতেনি। ছাপ্পাভোট তৃণমূলের মূলধন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েতগুলির বিরোধীশূন্য করার তাগিদে ভোট লুটের যে নজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাড়া করেছিলেন, তার ফল হয়েছে বিষময়। ভোটারদের একাংশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে একরোখা হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী হয়ে গেছেন। অন্যদিকে যেসব গুন্ডা বা সমাজবিরোধীদের কাজে লাগিয়ে ৩৪ শতাংশ পঞ্চায়েত বিরোধীশূন্য করেছিলেন, তারা আজ তৃণমূলের ছায়াও মাড়াচ্ছেন না। কারণ তারা চোখের সামনেই দেখছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ উঠে এসেছে। এই প্রতিপক্ষ আরও অনেকবেশি বড়ো আয়তনে। শক্তিতেও তুলনাহীন। হয় চুপচাপ বসে যাও, না হয় সরাসরি বিজেপির কর্মী হয়ে যাও। ঠিক একই কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বড়ো অংশের কর্মী ভাতঘুমে চলে গেছেন নয়তো বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে মুখ ফিরিয়েছেন তাঁরা। বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির ফলে অবহেলিত, বঞ্চিত অত্যাচারিত মানুষ যারা এতদিন গুন্ডামির মুখে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারেননি, এবার তাঁরা রুখে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পেয়েছেন। এবার ভোটে বিভিন্ন জায়গায় ওই নিপীড়িত জনগণ তৃণমূল কংগ্রেসকে যোগ্য জবাব দিয়েছেন। বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর প্রহরা।

নতুন ভোটাররা তৃণমূলের চাইতেও বেশি বিরক্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণে। এটা প্রায় সব জেলাতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত নতুন ভোটারদের কাছে মোদীজী অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। তাঁদের চোখে মোদীজী শক্তি, সাহস, উদ্যম এবং উন্নয়নের প্রতীক। ফলত উন্নয়নকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর চ্যালা (পড়ুন অনুব্রত মণ্ডল)-দের গুড়-জল, বাতাসা জল, নকুলদানা জল আর পাঁচনের বাড়ি খাওয়ানোর হুমকি দেন, তখন নতুন ভোটাররা প্রতিবাদ জানান মিটিঙে, মিছিলে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সমস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে, ফেসবুকের দেওয়ালে দেওয়ালে দিদিকে কার্টুন চরিত্র করে এঁকে, লিখে আর গান বেঁধে। পিসি-ভাইপোর কাণ্ডকারখানা আজ তাদের কাছে আড্ডার অন্যতম বিষয়। পরিস্থিতিটা এতটাই বাঁক নিয়েছে যে আজ বিজেপি পাল্টা মারের হুমকি দিতে পারে অথবা তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অভিযোগের সমন জারি করেন জনগণ। একদিকে গুন্ডাবাহিনী শিবির পাল্টাচ্ছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দাসত্ব মানতে মানতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে পুলিশ কর্মী এবং আমলাদের, কৌশলগতভাবে তারাও আজ বিদ্রোহের পথে। একটা ছোটো ঘটনায় পুলিশ লাঠিচার্জ করছে। গুলি চালাচ্ছে। এর পিছনে কৌশল তো আছেই। তাহলে কী দাঁড়াল? তৃমমূলের সঙ্গে আজ গুন্ডা নেই, পুলিশ নেই। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দলটিই নেই। কারণ বামফ্রন্টের ডান্ডা খেতে খেতে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের শিকড়কে মজবুত করে ধরে রেখেছিল, তারা চোখের সামনে দেখছেন ভাইপো অভিষেকের হবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অভিষেক হচ্ছে। দিদির গুণধর ভাই কার্তিক আর বাবুল রাতারাতি কিনে নিচ্ছেন দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট পাড়া। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন তিল তিল করে গড়ে তোলা তিলোত্তমা রাজ্যকে শুধু পাউডারের প্রলেপ আর লিপস্টিক ছুঁইয়ে উন্নয়নের ধুয়ো তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ দিদি আছেন। দলটিই গায়েব। আর মুখে কুলুপ এঁটে বসে আমলারা নবান্নের ঘরে ঘরে। কারণ তাঁরা জানেন, নিজের প্রয়োজনে দিদি তাঁদের নিয়ে রাজপথে ধরনায় বসতে পারেন কিন্তু তাঁদের প্রয়োজনে দিদি ধরনায় বসবেন না কোনোদিনই। রাজনীতির হাওয়া কখন শুকিয়ে যায় আর কখন তা কার পক্ষে সাইক্লোন হয়ে ওঠে, আমলাদের চাইতে ভালো করে কে বুঝবেন? অতএব দিদির থেকে প্রশাসন মানসিক স্তরে শত যোজন দূরে। এবারের ভোট তাই দিদির ভোট। তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট নয়।

সুযোগ বুঝে খেলছে বামফ্রন্টও। দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনৈতিক দল সিপিআইএম ও বামশরিকরা একটা সত্য মেনে নিয়েছেন যে রাম ছাড়া বাম নেই। অতএব রামকে জিইয়ে রাখ। সেজন্যই এবার ভোটে বামদলগুলির নীচুতলার বহু ভোট ঢুকেছে বিজেপির বাক্সে অবধারিত ভাবেই। বিশেষ করে সেইসব কেন্দ্রে যেখানে কোনও বামপ্রার্থী নেই। সেই সব কেন্দ্রে রামই তাঁদের প্রার্থী হয়ে উঠেছে। একই ঘটনা ঘটেছে কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও। তারাও বুঝেছেন, তৃণমূলকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করার চেয়ে কেন্দ্রে আসবে যে দল তাকেই ভোট দেওয়া ভালো। এই সহজ অঙ্কটা এবার কষেছেন সাধারণ মানুষও। আর ভোটের ফলাফল অবধারিত হতে চলেছে সেই অতি সাধারণ অঙ্কের নিয়মেই। এবার চলুন— দেখা যাক, নির্বাচনের ফলাফল কী হতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম সাত দফায় ভোট হয়েছে রাজ্যের ৪২টি আসনে। কারণ একটাই মানুষের ভোটাধিকার ও সাংবিধানিক ভাবে রাজ্যের গণতন্ত্রকে ধরে রাখা। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম পদক্ষেপটিই তৃণমূলের পরাজয়ের প্রথম এবং প্রধান কারণ

হয়ে দেখা দেবে। কারণ ভোটাররা বুঝে গেছেন, তৃণমূল গণতন্ত্র মানে না বলেই এবার সাত দফায় ভোট। অতএব ত্যাগ কর তৃণমূল কংগ্রেসকে। এই মনোভাবের প্রভাব পড়েছে বা পড়বে সমস্ত আসনেই।

একেবারে প্রথম পর্বে নির্বাচন হয়েছে দুটি লোকসভা আসনে--- কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। এই দুটি আসনই এবারে পাচ্ছে বিজেপি নিশ্চিতভাবেই। কারণ এই আসনগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা যথেষ্ট কম এবং যেহেতু দুটি জেলাতেই বাংলাদেশের উদ্বাস্তু হিন্দু জনগণের প্রাবল্য, তাই স্বাভাবিকভাবে এই দুই জেলাতেই বিজেপির প্রাধান্য বেশি। ২০১৪ সালের ভোটেও আলিপুরদুয়ারে বিজেপি ২৭.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তার ওপর এবারে এই দুটি আসনেই কোনও বাম প্রার্থী নেই। অতএব ভোট কাটার সম্ভাবনা কম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোট হয়েছিল ১৮ এপ্রিল। তিনটি আসনে— জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও রায়গঞ্জে। একেবারে চোখ বুজে বলা যায়, এই তিনটি আসনই এবার দখল করবে বিজেপি। তার কারণ, জলপাইগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দিনই ভালো ফলাফল করতে পারেনি। বরং ওই কেন্দ্রে সিপিএমের প্রভাব ছিল বেশি। তবে পাশাপাশি ওখানে বামফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্বও ছিল। এবারও আছে। ফলে সিপিআইএমের একটা বড়ো অংশের ভোট আসছে বিজেপিতে শুধুমাত্র তৃণমূলকে দূরে রাখতেই। এই বামপন্থীদের একাংশ ভোট দিয়েছে হিন্দুত্বের জয় ঘটাতেও। তার ওপর আছে ২০১৪-র ফলাফল। যেখানে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ৪৩.৪ শতাংশ ভোট। দার্জিলিং কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই খেলা খেলে থাকুন না কেন, ওখানে হাজির না থেকেও নিঃশব্দে খেলছেন বিমল গুরুং। বিনয় তামাং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হলেও পাহাড়ি জনগণের মধ্যে তাঁকে নিয়ে অসন্তোষের শেষ নেই। তাছাড়া পাহাড়ি জনগণকে জাতিভিত্তিতে ভাগাভাগি করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পথে হেঁটেছেন, মানুষ তা ভালোভাবে নেননি। না পাহাড়ে, না সমতলে। তাছাড়া এই কেন্দ্রে সিপিআইএমও বিশেষ করে সমতলে শিলিগুড়ি পুরসভায় বামবোর্ডকে বাঁচাতে বিজেপিকেই যে ভোট দিয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। রায়গঞ্জ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন। এখানে মুসলমান জনসংখ্যা ৫৬ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, এই কেন্দ্রে বিজেপির জয় অসম্ভব। কিন্তু রায়গঞ্জে অদ্ভুত ভাবে বরাবরই সংখ্যালঘুদের বেশি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল নয়। এবারেও পেয়েছে। কিন্তু ভোটটা ভাগ হয়েছে চার ভাগে। কংগ্রেস ছাড়াও মুসলমান ভোট পেয়েছে তৃণমূল কিছুটা, কিছুটা সিপিআইএম। এমনকী রায়গঞ্জেই সম্ভব মুসলমান ভোটে ভাগ বসিয়েছে বিজেপিও। কারণ ওই সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের সংকট।

তৃতীয় পর্যায়ে পাঁচ কেন্দ্রে— বালুরঘাট, মালদা উত্তর, মালদা দক্ষিণ, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদে ভোট হয়েছে।

বালুরঘাটে ২০১৪-য় বিজেপি প্রায় ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবারে তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ছিল জনগণের মধ্যে। কারণ উন্নয়নের কাজ হয়নি। ক্ষোভ ছিল দলের মধ্যেও। কারণ প্রার্থী কেন্দ্রকে সময় না দিয়ে কলকাতায় নাটক নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তাছাড়া বালুঘাটে বিজেপি-এবার শক্তি বৃদ্ধি করেছে ভালোরকম। মালদার দুটি আসনই বরকত গনিখানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বরাবরই কংগ্রেসে নিবেদিত। এবার হঠাৎ করে মালাদা (উত্তর) কেন্দ্রের সাংসদ মৌসম নূর তৃণমূলে যোগ দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ভাই ঈশা খান চৌধুরীকেই সুবিধা করে দিয়েছেন। তবে মালদা উত্তরে মুসলমানদের একটা ভালো সংখ্যক ভোটার ২০১৪-র মতো এবারও বিজেপিকেই সমর্থন জানিয়েছে। ২০১৪-য় এই সংখ্যাটা ছিল ১৫.৫ শতাংশ। মালদা দক্ষিণে কংগ্রেস প্রার্থী আবু হোসেন খান চৌধুরীর জয় অবধারিত। কারণ এখানে বাড়তি সুবিধা-বামপ্রার্থী নেই। জঙ্গিপুরে প্রণব মুখার্জির ছেলে অভিজিৎ মুখার্জিই যে আবার জিতবেন মূলত মুসলমান ভোটে, তাতে সন্দেহ নেই। এই কেন্দ্রে মুসলমান ভোটার ৬০ শতাংশ। মুর্শিদাবাদেও কংগ্রেস প্রার্থীর জেতার সম্ভবনাই বেশি। এখানে মুসলমান ভোটার রয়েছেন ৫৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রথম তিনটি দফায় ১১টি আসনের ফলাফল হচ্ছে : বিজেপি-৬, কংগ্রেস-৫। পরিবর্তন হতে পারে শুধুমাত্র মালদা উত্তর কেন্দ্রে। হয়তো খুব কম ভোটের তফাতে তৃণমূল প্রার্থী মৌসম নূর জিতে যেতেও পারেন।

আসছি ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত চতুর্থ দফার নির্বাচনে। ভোট হয়েছে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর ও বীরভূম কেন্দ্রে। বহরমপুরে এবারও জিতবেন ২০১৪-য় পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোটে জেতা কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। এখানে সিপিএম প্রার্থী দেয়নি। রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শুভেন্দু অধিকারী চ্যালেঞ্জ নিয়ে পড়েছিলেন সেখানে। কিন্তু মুখ কালো করে কলকাতায় ফিরে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে অধীর চৌধুরীর মার্জিন অতটা থাকবে না। কারণ এবার বহরমপুরে বিজেপিও অনেক মজবুত। কৃষ্ণনগরে তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র শিক্ষিতা, ভালো বক্তা এবং প্রায় আড়াই কোটি টাকার মালকিন। তুলনায় বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে নতুন মুখ। কিন্তু ভালো ইমেজ। স্পোর্টসম্যান এবং ভদ্র। জবরদস্ত লড়ছেন এটা বলাই যায়। কারণ কৃষ্ণনগর বিজেপির গড়। স্থানীয় নেতৃত্বের সমর্থনও ছিল জোরদার। রাণাঘাট এবারে বিজেপির আসন। প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর জনসভায় রাণাঘাটের ভিড় সমস্ত জনসমাগমের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এবং এই জনসমাগম কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় এবং স্বতস্ফূর্ত। তারওপর এই আসনে ২০১৪-য় বিজেপি ১৫.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবার ভোট বাড়বে তবে আসনটি বিজেপির পক্ষে নিশ্চিত বলা যাবে না। বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে মূল লড়াই সিপিএম বনাম তৃণমূলের। আর আসানসোলে তো ফের বাবুল সুপ্রিয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ এবারে তাঁর অ্যাডভান্টেজ, তৃণমূলের সবচেয়ে খারাপ প্রার্থীটি ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি হলেন মুনমুন সেন। যিনি গ্ল্যামার দিয়ে বাঁকুড়ায় ঠকিয়ে ছিলেন ২০১৪-য় ঠিকই কিন্তু এবার মমতা তাঁকে শাস্তি দিতেই প্রার্থী করেছেন আসানসোলে। তাঁর হার ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। বোলপুরে তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াই জোরদার। ফলাফল অনিশ্চিত। তবে বীরভূম আসনটি এবার তারকাপ্রার্থী শতাব্দী রায়ের হাতছাড়া হচ্ছে

বলেই মনে হচ্ছে। তা বোঝা যাচ্ছে দুটি কারণে— প্রথমত তিনিই একমাত্র প্রার্থী যাঁকে জনগণ ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আর ভোটের দিন তাঁর মেন্টর অনুব্রত মণ্ডল ছিলেন নজরবন্দি। ফলে ছাপ্পা ভোটের ফয়দা এবার আর ঘরে তুলতে পারেননি।

পঞ্চম দফায় ভোট হয়েছে বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হুগলি ও আরামবাগে। এর মধ্যে বনগাঁ এবং ব্যারাকপুরে নিশ্চিত জয় পাবেন বিজেপি প্রার্থীরা। কারণ বনগাঁয় মতুয়া এবং তপশিলি ভোট এবারে বিজেপিকেই সমর্থন জানিয়েছে। এরা তা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় উপস্থিতি এবং উন্মাদনার মাধ্যমে। ব্যারাকপুর বরাবরই বাহুবলের আসন। এবার বিজেপি প্রার্থী সদ্য তৃণমূল ত্যাগী অর্জুন সিংহ। তাঁর প্রতিপক্ষ সেই তৃণমূল নেতা দীনেশ ত্রিবেদী যাঁকে জেতাতেন বাহুবলী অর্জুন সিংহ। অতএব ফলাফল কী হবে তা স্পষ্ট। তার ওপর এই কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী দেয়নি। এটা উপরি সুবিধা। শ্রীরামপুরে বিজেপি প্রার্থী দেবজিৎ সরকার তৃমমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে ভালো লাড়াই দিয়েছেন। হুগলিতে বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জিও লড়েছেন জোরদার। তবে হাওড়ায় বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্তর লড়াইটা দেখার মতো। প্রকৃতপক্ষে ওই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের দুটি ছাড়া বাকি পাঁচটিতেই তিনি উল্লেখযোগ্য ফলাফল করবেন। তাঁর সুবিধা হলো— তিনি নতুন মুখ এবং সৎ সাংবাদিক হিসেবে সুবিদিত। উল্টোদিকে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় নানা অভিযোগে অভিযুক্ত এবং নারদাকাণ্ডে ক্যামেরায় ধরা পড়েছেন যে হাত পেতে ঘুষ নিচ্ছেন। সুতরাং এখানে লড়াই সৎ এবং অসতের। পাল্লা ভারি নিঃসন্দেহে বিজেপির দিকেই। আরামবাগে সিপিআইএম জেতার সম্ভাবনা বেশি। উলুবেড়িয়ায় সম্ভবত জয়ী হবেন তৃণমূল প্রার্থীই। তবে এই কেন্দ্রে বিজেপির ভোট বাড়বে। ২০১৪-য় ওই আসনে বিজেপি পেয়েছিল ১১.৬ শতাংশ ভোট।

ষষ্ঠ দফায় যেসব কেন্দ্রে ভোট সেগুলি হলো— তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর, তমলুক, কাঁথি ও ঘাটাল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভবনাই বেশি। তবে ঘাটালে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেবের ভোট এবারে যথেষ্ট কমবে। মেদিনীপুরে টক্কর বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বনাম তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ ডাঃ মানস ভুঁইয়ার। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এবং শুধুমাত্র রাজ্যসভার সাংসদ হবার লোভে দলত্যাগী ডাঃ ভুঁইয়ার লড়াইটা এবার বেশ কঠিন। প্রচারে এবং প্রভাবে অনেকটাই এগিয়ে দিলীপবাবু তাঁর প্রচারের ধারাবাহিকতায় এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর এবং বাঁকুড়ায় জনজাতি ও তপশিলি ভোট এবার সবটাই পড়বে বিজেপির সমর্থনে। কারণ এই সবকটি অঞ্চলেই বিজেপির মজবুত সংগঠন। বাঁকুড়ায় হালে পানি পাচ্ছেন না রাজ্যের প্রবীণ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অথচ আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রে প্রচার করতে না পেয়েও বিষ্ণুপুরে বিজেপির প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। শেষ দফায় ভোট হয়েছে দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ডহারবার, যাদবপুর, কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ। জয়নগর, বসিরহাট ও মথুরাপুরে সিপিআইএম প্রার্থী দেয়নি। এর মধ্যে বসিরহাটে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী নুসরত জাহানকে জেতানোর জন্য দল ব্যাপক চেষ্টা করলেও দলীয় কোন্দল তাঁকে প্রতিদিন লড়াইয়ের ময়দান থেকে একটু একটু করে পিছিয়ে দিয়েছে। ঠিক একই অবস্থা যাদপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চিত্র তারকা মিমি চক্রবর্তীর। তিনি তাঁর প্রচারের ঘরানায় নিজেরই সর্বনাশ করেছেন। এখানে কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। বিজেপির প্রার্থী ড. অনুপম হাজরা। মূল লড়াই সিপিআইএম প্রার্থী প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বনাম প্রখ্যাত অধ্যাপকের। কলকাতা দক্ষিণে লড়াই বিজেপি প্রার্থী নেতাজীর বংশধর চন্দ্রকুমার বসুর সঙ্গে কংগ্রেসের মালা রায়ের। আছেন সিপিআইএম প্রার্থী অধ্যাপিকা নন্দিনী ভট্টাচার্যও। ত্রিমুখী লড়াইযে টক্কর সমানে সমানে। ২০১৪-য় এখানে বিজেপি ২৫.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। দমদমে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের লড়াইটা একটু শক্ত। কারণ প্রতিপক্ষ অভিজ্ঞ এবং নামজাদা সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায়। তার ওপর রয়েছে সিপিআইএমের ভালো ভাবমূর্তির প্রার্থী নেপালদেব ভট্টাচার্য। শমীক ভট্টাচার্য ভালো বক্তা, শিক্ষিত এবং সংসদীয় রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। তাঁর প্লাস পয়েন্ট হলো— তাঁর সৎ ভাবমূর্তি। তুলনায় সৌগত রায় নারদা ঘুষকাণ্ডে কলঙ্কিত। বারাসাতে সিপিএম প্রার্থী দেয়নি, লড়াই ত্রিমুখী। বিজেপির পালে হাওয়া। কলকাতা উত্তরে প্রার্থী বিজেপির অন্যতম নেতা রাহুল সিংহ। প্রতিপক্ষ চিট ফান্ড কাণ্ডে জেলখাটা অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৪-য় এখানে বিজেপি ২৬.১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবার এখানে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বেড়েছে অনেক। সুতরাং লড়াই জোরদার। তবে নজর কাড়ছে ডায়মন্ডহারবার। যেখানে সিপিআইএম প্রার্থী ডাঃ ফুয়াদ হালিমকে লড়তে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো হাজারো দুর্নীতির অভিযোগের তিরে বিদ্ধ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রতিদিনই লড়াইয়ের চাপ বেড়েছে অভিষেক ব্যানার্জি ওপর, কারণ দুর্নীতির অভিযোগও প্রমাণ-সহ ঢেলে দিচ্ছে সিপিআইএম নিত্যনিয়মিত। নিঃসন্দেহে ফলাফলও নজরকাড়া হবে ওই কেন্দ্রে। যেমন হবে বারাসাত কেন্দ্রেও যেভাবে তৃণমূলি বাহুবলী আরাবুল আর সব্যসাচী দত্ত এবার হাতগুটিয়ে বসে গেছেন।

সামগ্রিকভাবে ভোটের ফলাফল নিয়ে আগেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। কিন্তু ভোটের ট্রেন্ড এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কথা বলা বোধহয় ভুল হবে না, ন্যূনতম ১০ থেকে ১২টি আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। সংখ্যাটি ১৫/১৬-ও ছুঁতে পারে। তবে শতাংশের হিসেবে এবার ভোটে ছক্কা মারবে বিজেপি তা নিঃসন্দেহ। আর এবারের ফলাফল প্রমাণ করবে— পশ্চিমবঙ্গে দিদির ঔদ্ধত্যের যবনিকার সময় এগিয়ে এসেছে। মোদীজীর সুযোগ্য নেতৃত্বে যে নতুন ভারত গড়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ হবেন সেই উদ্যোগের নয়া শরিক। পশ্চিমবঙ্গবাসীও সগর্বে বলবেন— আমরা উন্নয়নে বিশ্বাসী। আমরা উদ্যোগে বিশ্বাসী। 'আমরা হিন্দুত্বে বিশ্বাসী। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। ভারতমাতা কী জয়।'

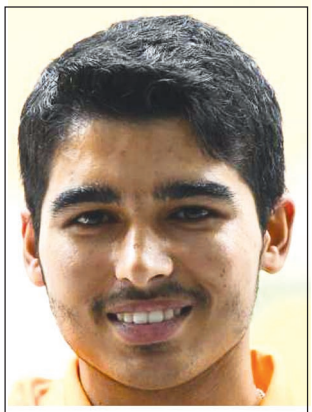
ক্রীড়াজগতে তরুণ তুর্কিদের জয়জয়কার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ইভেন্টে তরুণ ভারতীয় অ্যাথলিট ও ক্রীড়াবিদদের জয়ধ্বনি শোনা গেল এশীয় ও বিশ্বপর্যায়ের প্রতিযোগিতায়। স্বভাবতই এদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে। বস্তুত আন্তর্জাতিক স্তরের রাইফেল শুটার রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠোর দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী হবার পর থেকেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে সামগ্রিক ক্রীড়া ও শরীরচর্চার আঙ্গিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগে। গত পাঁচ বছরে এনডিএ শাসিত রাষ্ট্রপরিচালনায় রাজ্যবর্ধনের মন্ত্রীপদে আসীন হওয়াই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মন্ত্রী হয়ে রাজ্যবর্ধন পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা যদি ঠিকমতো বাস্তবায়িত হয় তবে অচিরেই ভারত বিশ্ব ক্রীড়াবৃত্তে সম্মানজনক অবস্থান গড়ে নেবে। তবে তার জন্য সরকারের মন্ত্রক সাই এবং দেশের সব খেলার জাতীয় ফেডারেশনকে একসঙ্গে পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে হবে।

বিশ্বশুটিংয়ের আসরে ভারতের পদক তালিকায় শীর্ষস্থান প্রাপ্তি রীতিমতো চমকপ্রদ বিষয়। মনুভাকের ও সৌরভ চৌধরি দুই 'অনূর্ধ্ব ২০' তরুণ-তরুণী মিক্সড এয়ার পিস্তল ইভেন্টে বিশ্বরেকর্ড-সহ সোনা জিতে গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত বছরের কমনওয়েলথ গেমস থেকেই এই দুজন সাড়া জাগানো পারফরমেন্স মেলে ধরছেন। নিজেদের ক্ষেত্রে বিশ্বমানে পৌঁছে গেছেন। তবে তাদের যাত্রা নিয়ে যাতে কোনো বাধা না আসে তা দেখা কর্তব্য জাতীয় শুটিং ফেডারেশনের। তাদের হাতে বিশ্ব ও ইউনিভার্সিয়াড চ্যাম্পিয়ন উপর্যুপরি বধ হয়েছেন বিভিন্ন আসরে এবং অতি সম্প্রতি চীনের উহানে বিশ্বকাপ শুটিংয়ে। ধনী কৃষিজীবী জাঠ পরিবারের সন্তান হওয়ার সুবাদে বাড়িতেই পরিকাঠামোগত সুযোগ সুধিধে পেয়েছেন মানু ও সৌরভ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে চরম আত্মপ্রত্যয়ী জেদ, সংকল্প, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও টেকনিকের উৎকর্ষ।

ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের খেলা কুস্তি। পঞ্জাব-হরিয়ানার বিভিন্ন আখড়ায় বছরের পর বছর সাধনায় রত মল্লবীরের দেশের জন্য প্রচুর সম্মান-গৌরব এনে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বজরং পুনিয়া ফেদারওয়েট ক্যাটাগরিতে বিশ্বসেরা গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে সোনা জেতার পর কয়েকদিন আগে এশিয়ান মিটে নিজের খেতাব ধরে রাখেন। যে কটি টুর্নামেন্টে নেমেছেন বজরঙ, প্রতিটা ক্ষেত্রেই বিজয় মঞ্চের একেবারে সবচেয়ে উচুধাপে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কমনওয়েলথ, এশিয়া, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব তাঁর ক্যাবিনেটে



সৌরভ চৌধুরী



মানু ভাকের



বজরং পুনিয়া

শোভা পাচ্ছে। পালোয়ানি সমাজে তার নাম ধরে হনুমান বজরংবলী। প্রথাগত টেকনিক ও স্টাইল থেকে বেরিয়ে এসে নিত্যনতুন কৌশল আয়ত্ত করে বিশেষ ঘরনার জন্ম দিয়েছেন বজরং। নিজের ক্যারিশমা ধরে রেখে এগিয়ে যেতে পারলে অচিরেই বজরং ভারতের সর্বকালের সেরা মল্লযোদ্ধার স্বীকৃতি পেয়ে যাবেন।

এশিয়ান ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড কিন্তু ভারতকে খানিকটা হলেও হতাশ করেছে। গত বছর জাকার্তা এশিয়ান গেমস থেকে আটটি সেনা এসেছিল। দোহার এটিএফ মিটে সেখানে মাত্র চারটি সোনা জয় সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। শটপাটে ভারতীরা বিগত ৩০ বছর ধরে এশীয় পর্যায়ে অপরাজেয়। দোহায় তেশীন্দার পাল সিংহ এশিয়ান রেকর্ড-সহ সোনা জিতে প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছেন। স্বপ্না বর্মণ হেপ্টাথেলনে রুপো জিতে খানিকটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছেন। ব্যর্থ হয়েছেন দ্যুতি চাঁদ ভারতের মহিলা রিলে দল। তবে মাঝারি পাল্লার দৌড়ে খানিকটা হলেও মুখরক্ষা হয়েছে। আশার কথা, বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিমান অ্যাথলিট দরজায় কড়া নাড়ছেন, যাঁরা অ্যাথেলেটিক্সের ঐতিহ্যমণ্ডিত পতাকা বহন করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন।

দুই তরুণ বক্সার অমিত পাঙ্গাল ও কবিন্দার সিংহ ফাটাফাটি কাণ্ড করে দিয়েছেন এশীয় বক্সিং মিটে। অমিতের আপার কাট জ্যাবের কোনো হদিশ পাননি কাজাখাস্থান ও ইরানের বিশ্বমানের ফাইটাররা। বিজেন্দার সিংহ বিকাশ কৃষ্ণনের যোগ্য উত্তরসূরী অমিত, কবিন্দাররা। বিজেন্দার এখনো পর্যন্ত এশীয়-ওশেনীয় পেশাদার বক্সিংয়ে অপরাজেয়। আর বিকাশ যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদার বক্সিং রিঙে ফুল ফোটাচ্ছেন। তবে এশীয় মিটে শিবা থাপা হতাশ করেছেন। অমিত পাঙ্গালই ভারতের ভবিষ্যৎ। এবছর বিদেশে যাচ্ছেন ট্রেনিং নিতে। ফিরে আসার পর আরও শাণিত, পরিশীলিত হয়ে রিঙে নামবেন। তখন বিশ্ব পর্যায়ে আরও বড়ো সাফল্য করায়ত্ত হবে একথা বলে দেওয়া যায়। ■

লেখনীবন্ধু

নীহারকণা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। আজ থেকে আট বছর আগে এক বিদ্যোৎসাহী মহিলার স্মৃতিতে তাঁর স্বামী ও পুত্রেরা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিদ্যালয় আজ চারাগাছ থেকে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য



হারে। মাধ্যমিকে এই বিদ্যালয়ের রেজাল্ট খুবই ভালো হয়। শিক্ষিকারাও সৎ, পরিশ্রমী ও আন্তরিক বলে সুনাম রয়েছে। তাই অভিভাবকরাও এখানে তাঁদের মেয়েদের পড়িয়ে সন্তুষ্ট।

এই বিদ্যালয়ে সেদিন মহা শোরগোল। ইংরেজির শিক্ষিকা বিনতাদি কয়েক মাস আগে ছাত্রীদের একটি পেনফ্রেন্ড অর্গানাজেশনের ঠিকানা দিয়েছিলেন সেখানে চিঠি লিখলে লেখনীবন্ধু পাওয়া যায়। সেই প্রতিষ্ঠান থেকে রিয়ার নামে একটি চিঠি এসেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। তারা বাংলাদেশের একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর কোনও এক রিংকু খাতুনের নাম ও ঠিকানা পাঠিয়েছে। রিয়া প্রথমে পেল। পরে নাকি সবাই এরকম নাম ও ঠিকানা পাবে। রিয়া বাড়ি ফিরেই বাংলাদেশের বন্ধু রিংকুকে চিঠি লিখে বাবার হাতে পোস্ট করার জন্য দিল। আর সেদিন থেকেই রিয়ার মন হাওয়ায় উড়তে লাগল। পত্রবান্ধবীর উত্তরের আশায় কালগোনা তার নিত্যকর্মের মতো হয়ে দাঁড়াল। কদিন পরেই চিঠি এসে গেল। রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখে চিঠি পোস্ট করে ফেলল। ইতিমধ্যে তারা পরস্পর 'পত্রলেখা' পাতিয়েছে। দুজনেই দুজনকে চিঠিতে 'পত্রলেখা' সম্বোধন করে।

রিংকু চট্টগ্রামের মেয়ে। ওর বাবার পোশাকের ব্যবসা। ঠাকুমা, বাবা-মা ও একটি ছোটো ভাইকে নিয়ে ওদের পরিবার। রিয়ারও তাই। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ধরনের বিষয়বস্তুই থাকে ওদের চিঠিতে। রিংকু চিঠিতে জানায় পাহাড় সমুদ্র ঘেরা ওদের সুন্দর শহর চট্টগ্রামের কথা, চাটগেঁয়ে ভাষার অভিনবত্বের কথা। কালীপূজার উচ্চারণ ওদের ভাষায় করা হয় স্কালীফুজা(Xalifooja)। এই ভাবে পাঁউরুটি ওদের উচ্চারণে হয় ফাঁউরুটি। চিঠিতে কখনও আসে চট্টগ্রামের বীরাঙ্গনা প্রীতিলতার কথা। ইউরাপীয় ক্লাবের নাম এখন হয়েছে 'চিটাগং ক্লাব'। রিয়াও জানায় কলকাতার দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উৎসবের কথা।

রিয়া একদিন জানাল, রিংকু আসছে কলকাতায়। খুবই বড়ো খবর। ইতিমধ্যে দুজনের ফোটো বিনিময়ও হয়েছে। সুতরাং এয়ারপোর্টে দুজন দুজনকে চিনতে পারবে। নির্দিষ্ট দিনে রিয়া বাবার সঙ্গে এয়ারপোর্টে গেল রিংকুকে আনতে। ও একাই এসেছে। ওর বাবা ওকে এয়ারপোর্টে এনে ফ্লাইটে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। রিংকু বেরিয়ে এল। দেখেই চিনতে পারল রিয়া। সালোয়ার কামিজ পরা। খুবই স্মার্ট। পনিটেল করে চুল বাঁধা। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল। বাবা বললেন, তাহলে লেখনীবন্ধুদের সশরীরে দেখা হলো। ওরা হেসে উঠল। রিংকু রিয়ার বাবাকে প্রণাম করল।

দারুণ বিস্ময়ে কলকাতার রাস্ত-ঘাট দেখতে দেখতে রিংকু পৌঁছে গেল রিয়াদের বাড়িতে। মাকে প্রণাম করতে মা বললেন, মনের মিলের মতো তোমাদের নামের মিলও রয়েছে-- রিয়া আর রিংকু। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর রিংকু সুটকেস থেকে বের করল রিয়ার জন্য ঢাকাই ওড়না, মায়ের জন্য একটি ঢাকাই ব্লাউজ পিস আর বাবার জন্য ঢাকাই কাজ করা কুশন কভার। বলল, আম্মা পাঠিয়েছেন। মা বললেন, সত্যি কাজগুলো খুব সুন্দর। তোমার মাকে আমাদের ধন্যবাদ ও ভালাবাসা জানিও।

দু'তিন দিনে ওরা রিংকুকে রবীন্দ্র সদন, নন্দন, মেট্রোরেল, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর সবই দেখিয়ে দিল। রিংকু বলল, তোমাদের এখান লেখা রয়েছে 'Blow Horn' , আমাদের ওখানে লেখা আছে 'ভেঁপু বাজান'। তোমাদের এখানে লেখা রয়েছে ' Turn Right, Turn Left, আমাদের ওখানে লেখা আছে 'ডানে মোড় ' , 'বাঁয়ে মোড়'। তোমাদের নিজেদের ভাষায় কেন লেখা নেই? রিয়া ওর কথাতে একটু লজ্জা পেল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

রিংকুর ফেরার দিন সবার মন খারাপ। রিয়াকে চট্টগ্রামে ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলল রিংকু। রিয়ার বাবা বললেন, কলম বান্ধবীও যে সাধারণ বান্ধবীদের মতো এমন একাত্ম হয়ে যায় তা রিয়া-রিংকুকে দেখেই বোঝা গেল। একটু পরেই ওরা দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। বিমান উড়ে গেল পদ্মাপারের পাহাড় ঘেরা চট্টগ্রামের দিকে।

রূপশ্রী দত্ত

ভারতের পথে পথে

উজ্জয়িনী



মহাকহি কালিদাস, সম্রাট আশোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য অবন্তিকা কালে কালে উজ্জয়িনী হয়েছে। স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে অবশ্য উজ্জয়িন। চম্বলের শাখা শিপ্রানদীর তীরে মালব মালভূমিতে ৪৯১ মিটার উঁচু মালভূমিতে উজ্জয়িনী নগরী। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম হিন্দু তীর্থ অন্যতম সতীপীঠ ও সপ্তপুরীরও এক এই উজ্জয়িনী। বারো বছর পর পর এখানে পূর্ণকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের দক্ষিণে শিপ্রনদীর পাড়ে মহাকালেশ্বর মন্দির অবস্থিত। মূল মন্দির মুসলমান আক্রমণকারী ইলতুতমিসের হাতে ধ্বংস হলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় নির্মাণ করেন সিন্ধিয়ারাজ। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও ভোরে ভস্মারতি দেখতে দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা ভিড় করেন। অদূরে রয়েছে হরসিদ্ধি পাহাড় ঢালে বড়া গণেশ মন্দির। রাজা বিক্রমাদিত্যের আরাধ্য হরসিদ্ধি মাতার মন্দির। শিপ্রনদীর তীরে রয়েছে বেতালসিদ্ধ বটবৃক্ষ। নদীর বামতীরে রয়েছে ভর্তৃহরি গুহা, শ্রীরামমন্দির, রামঘাট, গোপাল মন্দির, গড়কালিকা মন্দির কালভৈরব মন্দির ইত্যাদি।

জানো কি?

বিভিন্ন রাজ্যের প্রচলিত নৃত্য

- তামিলনাড়ু--- ভরতনাট্যম্, কোলাট্টাম, কুম্মি, থেরুংকোট্টু, তেরাতলি, কারাগাম, কাভাডি।
- মহারাষ্ট্র---তামাশা, দাহিকালা, লেজিম, লাবনী, কালি, গাফা, নাকাতা।
- গোয়া— ফুগডি, ঢালো, ডেকানি, মান্ডো, কুম্বি।
- গুজরাট--- টিপ্পানি, ডান্ডিয়ারাস, গরবা, রাসিলা, ভাবাই, গরমা।
- মিজোরাম— চিরাও, বাঁশ নৃত্য, লাম, কুয়াল্লাম, চেরোকান।

ভালো কথা

দোষী কে?

ক'মাস আগে ট্রেনে বাবার সঙ্গে মামার বাড়ি কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলাম। চারদিকে ঘর-বাড়ি, সবুজ গাছপালা, মাঠ, মাছের ভেড়ি ধানক্ষেত দেখতে দেখতে যাচ্ছি। মনটা আনন্দে ভরে উঠছে। হঠাৎ আমাদের কামরায় খুব চিৎকার শুরু হলো। আমি উঠে গিয়ে দেখলাম একটি বারো-তেরো বছরের ছেলেকে সবাই চোর চোর বলে ভীষণ মারছে। ছেলেটি বলছে আমি চুরি করিনি। আমার পকেটে মানি ব্যাগটা কীকরে এল বুঝতে পারছি না। বাবা আমাকে ডেকে বসিয়ে দিয়ে উঠতে বারণ করে নিজেই উঠে গেল কী হয়েছে দেখতে। ছেলেটিকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওর চোখ-মুখ ফেটে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমি লুকিয়ে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে চিৎকার করে বললাম, কাকু, একবার আমার কথা শোনো। ছেলেটির কোনও দোষ নেই। মানিব্যাগটি পড়ে থাকতে দেখে আমিই ওর পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমার কথা শুনে সবাই থেমে গেল। আমাকে কেউ কিছু বলল না। বাবা কিন্তু আমার ওপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। এরকম করার জন্য পরে আমাকে খুব ধমক দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে একটা দ্বন্দ্ব রয়েই গিয়েছে। এখানে সত্যিকারের দাষী কে, আমি না ছেলেটি? আমি কি ছেলেটিকে বাঁচিয়ে ঠিক করেছি না ভুল? এর উত্তর আমি আজও খুঁজে পাইনি। নাবাঙ্কুরের বন্ধুরা জানলে উত্তর দিও।

রূপষা দেবনাথ, নবম শ্রেণী, বিরাটি, কলকাতা-৪৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

ফনির ভয়

সুজন সিংহ, সপ্তম শ্রেণী, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

ফনি আসছে সবার ভয়
কখন যে কী হয়
সবই নাকি উড়িয়ে নেবে
মানুষজনের কী যে হবে।
ছোবল মেরেছে পুরীর মাথায়
লণ্ডভণ্ড হয়েছে হাওয়ায়,
পশ্চিমবঙ্গে আসেনি ফনি
শুধু দুদিন বৃষ্টি একটুখানি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২৩।।



বন্দে মাতরমে ইংরেজ ভয় পেত জয় শ্রীরামে দিদি ভয় পাচ্ছেন

সরোজ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের ভোট এবার যেন রামকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। অন্য সব ইস্যুকে ছাপিয়ে দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্রই ভোটের সবচেয়ে বড়ো তুরুপের তাস। বাঙ্গলার ভোট রাজনীতিতে 'শ্রীরামচন্দ্র' এখন ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। বাঙ্গলার হিন্দুরা 'শ্রীরাম'-এর নাম মন্দিরে বসে করতেন।আসরে হতো রামনামের চর্চা। কিন্তু এখন বাঙ্গলার রাজনীতিতে শ্রীরাম নিয়ে আলোচনা চলছে মন্দির থেকে ময়দানে, চায়ের ঠেক থেকে বারোয়ারির আড্ডায়, গৃহস্থের বৈঠকখানা থেকে জনবহুল বাজারে, ট্রেনে, বাসে সর্বত্র। যে হিন্দুরা শ্রীরামের নাম মন্দিরের পূজা-অর্চনায় বা হরিনাম কীর্তনে বা রামনামের আসরে করত এবং অল্পসংখ্যক হিন্দুরাই যে রামনামের স্মরণে নিবেদিত থাকত, সেই রামনাম এখন বাঙ্গলার ঘরে বাইরে চর্চার মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই বাঙ্গলার রাজনীতিতে এখন শ্রীরামই একমাত্র আলোচ্য চরিত্র। আর এই বাতাবরণ তৈরিতে যিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন, তিনি বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জয় শ্রীরামর উচ্চারণ করলেই তৃণমূল নেত্রী রেগে যাচ্ছেন। রামনাম তিনি শুনতে চান না। এই বাঙ্গলায় যদি কেউ শ্রীরাম বা জয় রাম বা জয় শ্রীরাম বলেন, তাকে তিনি জেলে ভরার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে নির্বাচনী প্রচারে চন্দ্রকোণার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেন কিছু সাধারণ গ্রামবাসী। আর তাতেই চটে গিয়ে কনভয় থামিয়ে রাস্তায় নেমে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাকে গালাগাল দিচ্ছে। সাহস থাকলে সামনে আয়। পালাচ্ছিস কেন?' সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এরপর 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়ার অপরাধে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সীতারাম মিদ্দা, সায়ন মিদ্দা ও বুদ্ধদেব দোলুই।

> "
> 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নিয়ে বাঙ্গলায় শাসক দল যে লড়াই শুরু করেছে, তা পবিত্রতা ও শান্তিকে নষ্ট করছে। শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীর যে মন্তব্য, তা নির্বাচনের ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবেই—কারণ বাঙ্গলার জনগণ শান্তি চায়। আদর্শ চায়। সংহতি চায়। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও সুখের 'রামরাজ্য চায়'।
> "

এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই সংগঠনের এক শীর্ষ কার্যকর্তা বলেন, ''আমরা শুনেছিলাম ব্রিটিশদের রাজত্বে বাঙ্গলায় 'বন্দে মাতরম্' স্লোগান দেওয়া যেত না। কেউ সাহস করে 'বন্দে মাতরম্' বললে তাকে জেলে পোরা হতো। এখন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের জন্য একই রকমের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। 'জয় শ্রীরাম' বললে জেলে যেতে হচ্ছে।''

হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র। যার উপর আপামর হিন্দুদের আস্থা রয়েছে। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যিনি পূজিত হন। সেই রামের নাম নেওয়াকে উনি গালাগালি বলছেন? এতে বাঙ্গলার হিন্দুরা অবশ্যই অপমানিত বোধ করবেন। ওঁর এজন্য বাঙ্গলি হিন্দুদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ''জয় শ্রীরাম বললে এখন জেলে ভরছেন দিদি। তিনি কটাক্ষ করে আরও বলেন, দিদি ইদানীং এতটাই হতাশ যে ভগবানের কথাও বলতে চান না। শুনতেও চান না। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এখন এমন যে কেউ জয় শ্রীরাম বললেও তাকে গ্রেপ্তার করে দিদি জেলে ভরে দিচ্ছেন। স্পিডব্রেকার দিদির অহংকার বেশি।'' মোদীজী বলেন, ''এবারের লোকসভা নির্বাচনে দিদির পরাজয় নিশ্চিত। তৃণমূল এবার দশটার বেশি আসন পায় কি না সন্দেহ রয়েছে। কারণ, দিদির চমক, ধমক আর কোনওটাই কাজ করছে না। বিজেপির



ফঃ ৬

জনসভাগুলোতে কাতারে কাতারে জন সমাগম দেখে দিদির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। নিশ্চিন্তে তিনি ঘুমোতে পারছেন না। তাঁর রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। তাই দিদি এতটাই হতাশ যে, ভগবানের নামও শুনতে চাইছেন না।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'জয় শ্রীরাম' বলায় পুলিশ তিনজনকে আটক করে। তাদেরই মধ্যে একজন হলো সীতারাম মিদ্দা। তিনি বিজেপির যুবমোর্চার চন্দ্রকোনা দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি। সীতারামবাবু বলেন, 'পুলিশ আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, কেন জয় শ্রীরাম বলেছিলাম'। তিনি আরও বলেন, 'জয় শ্রীরাম বলার মধ্যে অপরাধটা কোথায়?' এদিকে ওই তিনজনকে আটক করে আনার ব্যাখ্যা দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'এটা ভিভিআইপির নিরাপত্তার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির সামনে এসে এভাবে কিছু বলা যায় না। তাই জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই থানা নিয়ে আসা হয়েছিল।

এই 'জয় শ্রীরাম' বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ রাজ্যে প্রচারে এসে বলেন, 'জয় শ্রীরাম বলায় দিদি লোককে জেলে ঢোকাচ্ছেন। আমারও মনে হলো, আমিও দিদিকে সরাসরি জয় শ্রীরাম বললে আমাকেও জেলে ঢুকিয়ে দেবেন। নির্দোষ যাঁরা জেলে রয়েছেন, তাহলে আমি তাঁদের সেবা করতে পারব।' এরই সঙ্গে মমতাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'রামের কাছে বড়ো বড়ো ব্যক্তির অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আপনার অহংকার কোথায় থাকবে।'

একটি নির্বাচনী সভায় তৃমমূল নেত্রী বলেছিলেন, 'রামকে ওরা (বিজেপি) ভোটে এজেন্ট করেছে।' সেই প্রসঙ্গ টেনে মোদীজী বলেন, 'আপনাকে বলে দিচ্ছি, রাম আমাদের মাথার উপরে রয়েছেন। সংস্কৃতিতে রয়েছেন। রাম আমাদের প্রজ্ঞা, প্রেরণা। আমাদের রাজনীতির পথ প্রদর্শক।'

শ্রীরামচন্দ্র সনাতন ভারতের আদর্শ, প্রাণপুরুষ। কোটি কোটি ভারতবাসীর আরাধ্য ভগবান। বাঙ্গলা সহ গোটা ভারত রামময়। সেই রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি কি গালাগাল? হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলেন, আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে ফুলিয়ার গঙ্গার তীরে বসে কৃত্তিবাস ওঝা রচনা করেছিলেন শ্রীরাম পাঁচালি, যা আজও 'বাঙ্গলা রামায়ণ' রূপে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সমাদৃত। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র আজও বাঙ্গলার গ্রামে-শহরে ভক্তির প্লাবন বয়ে যায়। ভিখারি ও সাধু-সন্ন্যাসীরা জয়রাম, জয় কৃষ্ণ নাম নিয়ে গৃহস্থের দুয়ারে উপস্থিত হয়। পূজাপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানে আজও বাঙ্গলার গ্রাম-শহরে ভগবান রাম ও কৃষ্ণের কাহিনি অবলম্বনে যাত্রাপালা সমাদৃত। পাঠ হয় রামগান। যাতে সীতা-বিরহী রাম ও বনবাসী মা সীতার বেদনায় বাঙ্গলায় নারী-পুরুষ আজও আঁচলে চোখের জল মোছে। শ্রীরামচন্দ্র সনাতন ভারতের আদর্শ প্রাণপুরুষ। কোটি কোটি ভারতবাসীর আরাধ্য ভগবান। বাঙ্গলা-সহ গোটা ভারত রামময়। শ্রীরামচন্দ্র পুত্রধর্ম পালন করার জন্য নির্দ্বিধায় রাজসুখ ত্যাগ করে ভিখারি সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছেন। প্রজার প্রতি রাজধর্ম পালন করতে সহস্র মাইল বন ও সমুদ্র পার হয়ে জীবনমরণ সংগ্রাম করেছেন। প্রজাধর্ম পালন করতে গিয়ে প্রাণপ্রিয়া পত্নী সীতাকে ত্যাগ করেছেন। তাই শ্রীরামচন্দ্র ভগবান। তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ নাকি কাল্পনিক চরিত্র সে বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখেই তাঁর থেকে আমরা অনন্ত আদর্শ শিক্ষা ও গুণে শিক্ষিত হয়ে নিজ পরিবার, সমাজ ও দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারি।

ভারতবর্ষে বিজেপি, আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল নিষিদ্ধ নয়। তাই এই সব দলের সমর্থকরাও ভারতীয় সংবিধানে নিষিদ্ধ নয়। আবার রামনাম, জয় শ্রীরাম ধ্বনি আইন বিরুদ্ধ নয়। ভারতের সংবিধান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রার অধিকার দিয়েছে সব নাগরিককে। ভারতবর্ষের সংবিধানে নাগরিকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। অথচ নাগরিকরা সে অধিকার পাচ্ছে না। শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা সাধারণ জনগণের সেই অধিকারে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। বিগত বেশ কয়েকবছর পশ্চিমবঙ্গের মস্তান, হার্মাদ, গুন্ডরা জোরপূর্বক শক্তিপ্রদর্শন করে সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে। হিন্দুরা এখন বিরোধী রাজনৈতিক দলের হামলায় ও সন্ত্রাসে নিজের ধর্ম পালন করতে পারছে না। শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বনি তুলতে পারবে না বলে নির্দেশ এসেছে। রামনবমীতে শোভাযাত্রা করা যাবে না। আর যদিও বা শোভাযাত্রা বের হয়, তাতেও নানা বাধা নিষেধ। ২০১৬ সালে বাঙ্গলার শাসকনেত্রী হঠাৎই চিৎকার করে বলতে শুরু করেন, রামনবমীর নামে ওরা দাঙ্গা বাধাতে চাইছে। এটা বাঙ্গলার সংস্কৃতি নয়। শোভাযাত্রাকারীরা কোথাও হাঙ্গামা করেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আক্রমণ করা হয়েছে। চন্দননগরের উর্দি বাজারে রামনবমীর শোভাযাত্রীরা আক্রান্ত হয়েছেন। ২০১৭ সালেও আবার তৃণমূল শাসক চিৎকার শুরু করে। শোভাযাত্রীদের উপর আক্রমণ করা হয় পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডির হুড়ুমদা ও সিন্ধ্রি গ্রামে। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা ও টিটাগড়ে। আসানসোলের পাণ্ডবেশ্বরে। হুগলির ভদ্রেশ্বরে ও তেলেনিপাড়ায়, কলকাতার গার্ডেনরিচ ও কালিন্দি-সহ আরও অনেক জায়গায়। গত বছর আসানসোলের ঘটনা তো বীভৎস আকার নেয় হনুমান জয়ন্তীতে। সমস্তটাই বাইরে থেকে জেহাদি আক্রমণ। অথচ শাসক আক্রমণকারীদের বিষয়ে উদাসীন। এছাড়াও কোথাও রথযাত্রায় বাধা ও নিষেধাজ্ঞা, কোথাও দুর্গাপুজোর শোভাযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় নানা বিধি নিষেধ। নাগপাশের মধ্যে ওরা হিন্দু ধর্মের আবেগ ও ধর্মীয় নিয়মনীতিকে বেঁধে রাখতে চাইছে। বাধা দিয়ে, হামলা করে, সন্ত্রাস চালিয়ে হিন্দুত্বের ভাবাবেগকে হিন্দুবিরোধী রাজনৈতিক দল ও সেই সব দলের নেতা-নেত্রীরা দেশে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। তাই ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে তারা উঠেপড়ে লেগেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং জয় শ্রীরামধ্বনি শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে কনভয় থামিয়ে নেমে তাড়া করেছেন। বলছেন, আমাকে গালি দেওয়া। জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে উনি গালিতে পরিণত করলেন। আসলে তৃণমূল নেত্রীর 'রামফোবিয়া' হয়েছে। তাই তিনি বলেন, আমি বিজেপির স্লোগান বলব না। বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শ্রীরাম ধ্বনি এখন ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে। এই কথা বলে এক ধর্মপ্রাণ ভক্ত বলেন। যে, 'রাম' নাম শুনলে, যে শ্রীরাম ধ্বনি উচ্চারণ করলে মানুষের

পাপ থেকে মুক্তি ঘটে, সেই শ্রীরাম ধ্বনি বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী বলতে চান না, আবার যারা সেই রামনাম করতে চাইছে, তাদেরও তিনি গ্রেপ্তার করতে চাইছেন, এটা ভাবাই যায় না। উনি পাগল হয়ে গিয়েছেন, নাকি ওনার মতিভ্রম ঘটেছে যে এই জাতীয় মন্তব্য করছেন। বাঙ্গলার মানুষ অনেক আশা ভরসা করে বামফ্রন্ট সরকারকে তাড়িয়ে মমতা ব্যানার্জিকে জিতিয়েছিলেন। বাঙ্গলার জনগণ তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন অনেক স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু এখন যা করছেন, তাতে হিন্দুরা রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গটা পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে গেল নাকি? হিন্দুরা বলছেন, আমরা ক্রমশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমাদের দেবদেবীদের পূজার্চনার করা ও শোভাযাত্রা বের করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শ্রীরাম ধ্বনি উচ্চারণে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত করা হচ্ছে। এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

হাওড়া রেল স্টেশনে কয়েকজন যাত্রী কৌতুক করে বলেন, শ্রীরাম ধ্বনি উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হলে শ্রীরামপুর রেলস্টেশনে যাতায়াতের জন্য টিকিট কাটার সময় কী বলব? ওই স্টেশনের নামে তো শ্রীরাম শব্দটি রয়েছে। আবার কিছু ধর্মপ্রাণ ভক্ত বলেন, এবার শেষে কি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করা যাবে না? কারণ সেখানেও তো শ্রীরাম শব্দটি রয়েছে। আবার যাঁরা রামঠাকুরের ভক্ত, তাঁরা বলেন, আমরা কি আমাদের গুরু শ্রীরামঠাকুরের নাম উচ্চারণ করতে পারবো না? কারণ সেখানেও তো শ্রীরাম ধ্বনি হয়েছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের শিক্ষকরা বলেন শ্রীরাম শব্দটিকে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে ঠিক এমন দাঁড়ায়—

শ্রীরাম = শ্ + র্ + ঈ + র্ + আ + ম্ + অ এর মধ্যে মূল অক্ষর 'র্' 'ম্' এবং 'অ' স্বরধ্বনি রয়েছে। ঠিক তেমনি 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়—

ব্ + অ + ন্ + অ + ব + এ + ম্ + আ + ত্ + অ + র্ + অ + ম্।

এই শব্দের মধ্যে 'মাতরম্'-এর মধ্যেও 'র্' ম্ এবং অ স্বরধ্বনি রয়েছে। অর্থাৎ 'রাম' শব্দের সঙ্গে 'মাতরম্' শব্দের মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে কি 'বন্দে মাতরম্'-এর উচ্চারণের সময় 'রাম' ধ্বনির অংশটি কি বাদ দিতে হবে? কেন না 'বন্দে মাতরম্' শব্দের মধ্যেও 'রাম' শব্দের ধ্বনি লুকিয়ে রয়েছে। তাই 'রাম' ধ্বনি উচ্চারণে বাধা এলে 'বন্দে মাতরম্' শব্দটিকে কি উচ্চারণ করা যাবে?

'শ্রীরাম' ধ্বনি উচ্চারণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের জেরে বাঙ্গলার রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। চলছে ব্যঙ্গ, চলছে কৌতুক, আবার চলছে সিরিয়াস আক্রমণ। এ বিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিডিয়া বিভাগের এক কার্যকর্তা জানান, 'একটি বিশেষ শ্রেণীকে খুশি করতেই এসব বলছেন উনি। রাজ্যে লোকসভা ভোট চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর এইসব বক্তব্যের প্রভাব নিশ্চয় ইভিএমে পড়বে। বাঙ্গলার হিন্দুদের কাছে রাম শুধু দেবতাই নন, রাষ্ট্রীয় পুরুষ।

শ্রীরাম চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর সশ্রদ্ধ অবধারণা যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়। শ্রীরামচন্দ্র হিন্দুর মননে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। তিনি বিষ্ণুর অবতার। তাঁর রাজ্য ধর্মরাজ্য। তাই সেখানে মানুষের শোক, দুঃখ, গ্লানি কম। রামরাজ্য কেমন, তার বর্ণনা রয়েছে শ্রীবাল্মীকি রামায়ণে।

"রাঘবশ্চাপি ধর্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সসুহৃজ্জ্ঞাতিবান্ধবঃ।।

... ...

রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভুতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে সকলে আনন্দিত ছিল ও ধর্মপরায়ণ ছিল। রামকে অনুসরণ করে কেউই পরস্পরকে হিংসা করত না। কোনও দস্যু ছিল না, কোথাও কোনও অনর্থ চোখে পড়ত না। সকলে বিনয়ী ও ধর্মপরায়ণ স্বভাবের ছিল ও পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত করত। সকলে ছিল বুদ্ধিমান ও গুণবান। সকলে গুণের সমাদর করত। রামরাজ্যে সকল ব্যক্তি উদারহৃদয়, পরোপকারী, ভক্তিপরায়ণ ছিল। রামরাজ্যের অতি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে তুলসীদাস বিরচিত রামচরিতমানসেও। রামরাজ্যে কোথাও অকালমৃত্যু ও রোগব্যাধি ছিল না, সকলে সুন্দর দেহ ও স্বাস্থ্যের অধিকারি ছিল। কেহ দরিদ্র বা দুঃখী ছিল না। কেউ অবুঝ বা কুলক্ষণমুক্ত ছিল না। ত্রিলোকে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হলো ও যাবতীয় শোক দূরীভূত হলো। মানুষ পরস্পরের প্রতি সর্বপ্রকার শত্রুতা ভুলে গেল ও রামের প্রভাবে তাদের বৈষম্য হারিয়ে গেল।

রাম শব্দের অর্থ বহুবিধ --- কল্যাণ, মঙ্গল, শান্তি প্রভৃতি। বিপরীতে রাবণ শব্দের অর্থ বীভৎস ও ভয়ংকর। আমরা রামায়ণে দেখি নানা দুর্যোগ ও বীভৎসতা অতিক্রম করে শ্রীরামচন্দ্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই শ্রীরাম শব্দটি কখনই অন্যায়, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতির পক্ষপাতী নয়। তা চিরকালীন, কল্যাণকর। ফলে এমন একটা নাম বা চরিত্র যিনি কেবলমাত্র বাঙ্গলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং এমনকী বহির্ভারতেও পরম শ্রদ্ধেয় ও আদর্শের আধার। এহেন শ্রীরাম ধ্বনি উচ্চারণে মানুষের পাপ ক্ষয় হয়। মানুষ আনন্দে ও শান্তিতে থাকতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম। তাই তাঁর কাছ থেকেই, তাঁর আদর্শ থেকে সংস্কার মুক্তির পাঠ নিতে হয়।

এক্ষেত্রে মানুষ যদি জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারতো, তাহলে সমাজে সংসারে এত অশান্তি থাকতো না। খণ্ড থেকে অখণ্ডে হাজির হওয়ার জন্য যে বোধ, যে ভাবনা— তাই শ্রীরামের কাছ থেকে শিখতে হবে। এনিয়ে রাজনৈতিক তরজা বিতর্ক করা কোনও সুস্থ মানসিকতার লক্ষ্মণ নয়। শ্রীরাম ও জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নিয়ে বাঙ্গলায় শাসক দল যে লড়াই শুরু করেছে, তা পবিত্রতা ও শান্তিকে নষ্ট করছে। একজন রাজার উচিত অন্য এক 'আদর্শ রাজা'কে সম্মান করা। কারণ একজন শাসক বা রাজা আর এক রাজা বা শাসকের কাছে রাজার মতোই সম্মান আশা করেন। তাই শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীর যে মন্তব্য, তা নির্বাচনের ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবেই— এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কারণ বাঙ্গলার জনগণ শান্তি চায়। আদর্শ চায়। সংহতি চায়। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও সুখের 'রামরাজ্য চায়'। ▮

মার্কিন নৌ-বাহিনী প্রধানের ভারত সফর



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মার্কিন নৌ-বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল জন মাইকেল রিচার্ডসন তিন দিনের সরকারি সফরে ভারতে এসেছেন। তাঁর এই সফর উভয় দেশের নৌ-বাহিনীর সম্পর্ককে নিবিড় ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তুলবে। অ্যাডমিরাল জন রিচার্ডসন আজ ভারতীয় নৌ-বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল সুনীল লানবার সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি প্রতিরক্ষা সচিব, নৌ-বাহিনীর উপ-প্রধান, বায়ুসেনার প্রধান, সিওএসসি-র চেয়ারম্যানের চিফ অব দ্য ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী দ্বিপাক্ষিক ও বহুমুখী ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ বজায় রেখে চলে। তারা মালাবার এবং রিনপ্যাকের মতো যৌথ সামুদ্রিক মহড়ায় অংশ নেয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতের জন্য দুই নৌ-বাহিনী মতামত বিনিময় করে। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অন্যতম প্রতিরক্ষা অংশীদারের স্বীকৃতি দেওয়ার পর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দু' দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে ২ + ২ মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বৈঠকে যৌথ মহড়া, প্রশিক্ষণ, তথ্য আদান-প্রদান ও ক্ষমতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব অমিত খারে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কান চলচ্চিত্র উৎসবের ভারতীয় প্যাভেলিয়নে দেশের চলচ্চিত্র, ভাষা, সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহায়তায়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে এই প্যাভেলিয়ন ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বন্টন-সহ আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে জানানো হবে। এখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন এবং ভারত এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিষয়ে তাঁদের জানাবেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব অমিত খারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় প্রতিনিধিদলে সিবিএফসি-র চেয়ারম্যান প্রসূন যোশী, চলচ্চিত্র নির্মাতা রাহুল রাওয়াইল, শাজিচ এন কারুন এবং মধুর ভাণ্ডারকর থাকবেন। চলতি বছরের শেষের



দিকে গোয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হবে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা এই বিষয়টি কান চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থাপন করবেন। এই উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ পোস্টারও প্রকাশ করা হবে।

এই প্রতিনিধিদল, ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে 'এক জানালা' ব্যবস্থার মাধ্যমে সিনেমার শ্যুটিং করার কাজ আরও সহজ করে তোলার বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি, সিনেমার জালিয়াতি ঠেকাতে সরকারি উদ্যোগের কথা তুলে ধরবে। ভারতে দক্ষ পেশাদার এবং প্রযুক্তিবিদের সহজলভ্যতা ও সিনেমার শ্যুটিংয়ের পর সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ পরবর্তী কাজকর্ম করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরা হবে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যৌথভাবে কাজ করার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা জানানো হবে। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব অমিত খারে জানান, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন। ফলে, আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্রের সুদিনের জন্য ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

ওড়িশায় ফণী ঘুর্ণাবর্তে প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ যোগদান, উঠে আসছে জোট সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এক সপ্তাহ আগে ওড়িশায় গিয়ে 'ফণীর' বিপদ মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ প্রসঙ্গে ঝড়ের আগে স্থানীয় প্রশাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ও ঘুর্ণিঝড় পরবর্তী ধ্বংসের মোকাবিলায় নবীনের অসাধারণ তৎপরতার কথা আলাদা উল্লেখ করেছিলেন মোদী। এই সূত্রে সম্প্রতি তাঁর সরকারের তরফে ও ব্যক্তিগত স্তরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পট্টনায়ক। তিনি বিপদের মুহূর্তে কেন্দ্রের এইভাবে রাজ্যের পাশে দাঁড়ানোর প্রশংসা করেছেন। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন প্রচারের সময় বাদ প্রতিবাদে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল উভয়ের সাম্প্রতিক সৌহার্দ্রের বাতাবরণে তা কেটে গিয়ে ফল ঘোষণা পরবর্তী সময়ে উভয় দলের কাছাকাছি আসার রূপালি রেখা দেখা যাচ্ছে বলে অনুমান।



নবীন তাঁর চিঠিতে লিখেছেন— 'Your goodself had personally witnessed the damage in the cydlone affected areas during your visit to the state on 6.5.2019." এই সূত্রে নবীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে PMAY (আবাস যোজনা) খাতে ৫ লক্ষ বিপর্যস্ত বাড়ির পুনর্নির্মাণের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নবীন সম্ভবত দুর্গতদের ত্রাণে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন।

চলতি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে ওয়াকিবহাল মহল নবীনের শাসনকালের প্রথম ১০ বছর যে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে চলেছিল সেকথা স্মরণ করাচ্ছেন। ইতিমধ্যে গত ৩০ এপ্রিল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে খনিজ মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও নবীন পট্টনায়ককে একত্রে খোলামেলা আলোচনারত অবস্থায় দেখার ভিডিয়ো ক্লিপ নজরে এসেছে।

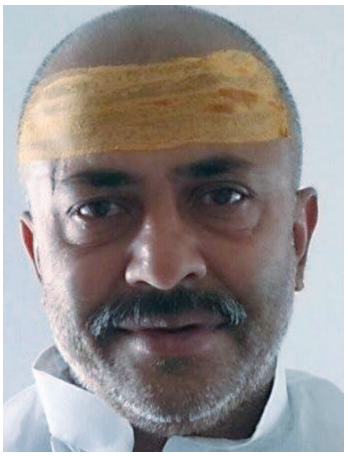
পূর্ব নির্ধারিত বিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে মায়াবতী, অখিলেশ থেকে মমতা কেউই ভরসা পেলেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু মে মাসের ২১ তারিখে যে ২১ দলের বিরোধী জোটের মিটিং দিল্লিতে হওয়ার কথা ছিল তাতে যোগদানের ব্যাপারে তাবড় নেতা নেত্রীদের সাড়া পেলেন না। নাইডু পশ্চিমবঙ্গের অত্যুৎসাহী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করে মিটিঙের কথা স্মরণ করালে মমতা তাঁকে ২৩ তারিখে ফলাফল বেরোবার আগে মিটিং না করার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি উত্তরপ্রদেশের মহাগঠবন্ধনের বুয়া-বাবুয়া অর্থাৎ মায়াবতী অখিলেশের মত জানতে চাইলে তাঁরাও তাঁকে হতাশ করে ফলাফলের আগে কোনো কিছু সম্মেলন করা উচিত হবে না বলে জানান। তাঁরা সরাসরি এই বিরোধী সভায় না যাওয়ার কথাও জানিয়ে দেন।

অখিলেশ বলেন প্রকৃত ফলাফল না দেখে এই ধরনের মিটিং করলে সেখানে গঠনমূলক কিছু প্রত্যাশা করা যাবে। ফলাফল বেরোলে সাংসদের সংখ্যাই যে চালিকাশক্তি হতে পারে অখিলেশের বক্তব্যে তা উঠে আসে। বসপা নেত্রীও যে তাঁর নির্বাচিত সম্ভাব্য সংসদদের সংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন তা স্বীকার না করলেও ফলাফলের আগে তিনি মিটিঙের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। হতাশ নাইডু কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছেও এই প্রস্তাব রেখেছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের বক্তব্য জানা যায়নি। ইতিমধ্যে পালটা ফ্রন্ট তৈরি করতে নাইডুর ঘোর বিরোধী তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়নের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একই সঙ্গে তিনি তামিলনাড়ুর বংশবাদী নেতা ডিএমকে-র সঙ্গেও যোগাযোগ করে নন কংগ্রেস-নন বিজেপি নামে আরও একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিচিত্র মোর্চা খোলার চেষ্টায় নেমেছেন বলে খবর। তাঁর ফ্রন্টটি কত নম্বরে আছে জানা অবশ্য যায়নি। তবে প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থীর জন্য এবার চাটাই বিছতেই হবে। নইলে বসবে কোথায় ?

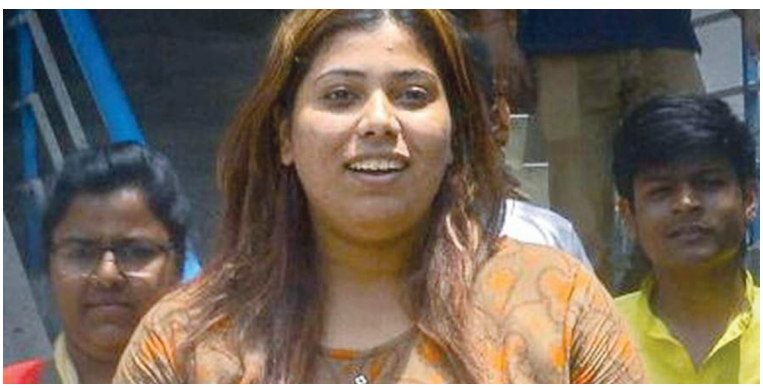
বিজেপির জয় আগাম ঘোষণা করে মধ্যপ্রদেশে অধ্যাপক সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় এখন কংগ্রেস। সম্ভবত সেই কারণেই সেখানে তালিবানি শাসন শুরু হয়ে গেছে। উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজু মুসলগাঁওকর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছিলেন। লিখেছিলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩০০-র বেশি আসন পাবে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! পোষ্টটি আপলোড হবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর জানিয়ে দেয়, বিজেপির জয় ঘোষণা করে ওই অধ্যাপক নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করেছেন। শিক্ষা দপ্তরের সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্র শুরু হয়ে যায় প্রতিশোধের প্রক্রিয়া। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মধ্যপ্রদেশ যুব কংগ্রেসের সচিব বাবলু খিনচি রাজু মুসলগাঁওকরের নামে এফ আই আর দায়ের করেন। রাজুবাবুকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তার জবাব বিশ্লেষণ করার



পর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হন যে অপরাধ গর্হিতই বটে। তারপরই তাকে সাসপেন্ড করা হয়। এই ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের রাজ্য-রাজনীতি এখন সরগরম। বিশিষ্টজন থেকে মধ্যপ্রদেশের সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের এই তালিবানি রাজনীতিতে একইসঙ্গে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। তাদের প্রশ্ন, কোন দল কটা আসন পাবে সেকথা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলে তা কীভাবে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করতে পারে? নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কংগ্রেস এতটাই ভীত যে বিজেপির হয়ে কেউ কথা বললেই তাকে যেন তেন প্রকারে চুপ করানোর জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভোটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশে সন্ত্রাসের আবহাওয়া কায়েম করছে বলে তাদের অভিযোগ। রাজু মুসলগাঁওকর বলেন, 'আমার এক ছাত্রের পোস্টের মন্তব্য করতে গিয়ে আমি ওই কথা লিখেছিলাম। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে জ্যোতিষীরা কী বলছেন সেটা জানানোই ছিল উদ্দেশ্য। শিক্ষাদপ্তর আপত্তি করার পর পোস্টটি মুছে দিয়েছিলাম, ক্ষমাও চেয়েছিলাম। তবুও অন্যায়ভাবে আমাকে সাসপেন্ড করা হলো।'

মমতার ব্যঙ্গচিত্র আঁকার অপরাধে ধৃত প্রিয়াঙ্কা জামিনে মুক্ত



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মজার ব্যঙ্গচিত্র এঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন বিজেপির যুবনেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মা। সেই ব্যঙ্গচিত্র নানা টাইমলাইনে ঘুরতে ঘুরতে খোদ নেত্রীর নজরে পড়ে যায়। পরের দিনই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ আদালতে প্রিয়াঙ্কাকে নিজেদের হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট প্রিয়াঙ্কাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। প্রিয়াঙ্কার বাবা-মা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রিয়াঙ্কার জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে এই জামিন নিঃশর্ত নয়। প্রিয়াঙ্কাকে মমতার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবেই মিলবে জামিন। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক জাস্টিস ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং জাস্টিস সঞ্জীব খান্না বলেন, 'প্রিয়াঙ্কাকে জামিন দেওয়া যেতে পারে তবে ওকে আগে ক্ষমা চাইতে হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার একটি ছবি সামান্য অদলবদল করে বিজেপি-নেত্রী মমতার ব্যঙ্গচিত্রটি তৈরি করেছিলেন। এতে অপমানজনক কিছুই ছিল না। ছবি দেখে সবাই মজাই পেয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে একই 'অপরাধে' গ্রেপ্তার করেছিল মমতার পুলিশ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিনি মুক্তি পান। প্রিয়াঙ্কার শর্তসাপেক্ষে জামিন পাওয়া প্রসঙ্গে বিজেপির আইনজীবী সেলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে সংবিধান-প্রদত্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হলো।' একই কথা শোনা গেছে শহরের কিছু বিশিষ্ট জনের মুখেও। তাদের বক্তব্য, মানুষের সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করাই আদালতের কাজ। কিন্তু এই রায় বিচারব্যবস্থার নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। শাসকের বিষনজরে পড়ার ভয়ে কেউ নাম ও পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কার মা মেয়ের মুক্তিতে খুশি। তিনি বলেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগে আমার মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মেয়ে মুক্তি পাওয়ায় আমি খুব খুশি।'

রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ ও রাজ্যবাসী

ডাঃ মদনলাল চৌধুরী

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে পাকিস্তানের জন্ম। পাকিস্তান যখন ইসলামিক তখন ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ঘোষণা না করাটা এক মারাত্মক ভুল যার ফলশ্রুতি রাজনীতিতে মিথ্যাচারের অনুপ্রবেশ হয়েছে। ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ঘোষণা করাটা অতন্ত জরুরি। কারণ হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুত্ব ধর্মান্ধতা নয়, এক জীবনধারা, যার আধারে ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি বিকশিত। ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ঘোষণা হয়ে থাকলে সব সম্প্রদায়ের মানুষই নিজ নিজ ধর্ম পালন করে দেশমাতৃকার সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভারতের উন্নয়নে যোগ দিত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সেই উন্নয়নে ভারত থাকত বিশ্বের প্রথম সারিতে। না হওয়ার ফলে হিংসাত্মক কার্যকলাপে মুসলমানদের নামই বেশি করে উঠে এসেছে। কারণ কংগ্রেস কমিউনিস্ট এবং তৃণমূলের ক্ষমতা লিপ্সা, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে এদের মিথ্যাচার এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে ভোটব্যাঙ্ক রূপে ব্যবহার। এই রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমানদের উন্নতির জন্য কোনো সদর্থক ভূমিকা নেওয়া তো দূরের, তোষণ নীতির মাধ্যমে তাদের ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে রেখেছে; শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে, তিন তালাক ও নিকাহ হালালের মতো ঘৃণ্য প্রথা, বহু বিবাহ ও বহু সন্তান প্রথা চালু রেখে এদের উন্নয়নের পথ অবরুদ্ধ করেছে। কন্যাশ্রী ইত্যাদির মাধ্যমে সাইকেল ইত্যাদি দিচ্ছে কিন্তু এদের ছেলে-মেয়েরা সরকারি চাকরির জন্য গেলে ১০-১৪ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করছে। এরা ভোটে ক্ষমতায় থাকতে বাংলাদেশি মুসলমান ও জঙ্গিদের অবাধ অনুপ্রবেশের অধিকার দিয়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজকে বদনাম করছে। যার জেরে পশ্চিমবঙ্গ আজ অপরাধের স্বর্গবাস ও জঙ্গিদের মরুদ্যান এবং বারুদের স্তূপের দণ্ডায়মান।

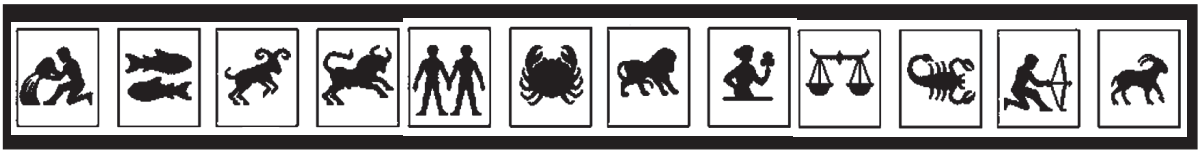
অনুপ্রবেশের ফলে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলির ভোট বাড়ে কিন্তু মুসলমানদের ভাঁড়ারে শিক্ষায়, চাকরি ইত্যাদি সবেতেই টান পড়ে, গরিব মুসলমান আরও গরিব হয়ে পড়ে। বাম শাসনকালে তৃণমূলনেত্রী ছিলেন অনুপ্রবেশের বিপক্ষে সব থেকে বেশি সরব আর এখন নিজ শাসনকালে তিনি অনুপ্রবেশের পক্ষে সওয়াল করছেন। এই দ্বিচারিতা এবং গরিবি হঠাওয়ের মিথ্যা স্লোগানে মুসলমানরা বিভ্রান্ত হতে আর রাজি নয়। সকালে মন্দির, দুপুরে মাজার এবং বিকেলে সাম্প্রদায়িক ভাষণের বানভাসি। গরিবি হঠাওয়ের স্লোগান নয়, তোষণও নয়, চাই এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, সামাজিক সুরক্ষা এবং দেশমাতৃকার সেবার দায়বদ্ধতার এক সমৃদ্ধ ও শক্তিধর ভারতবর্ষ যা এক স্বয়ংসেবক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' মন্ত্রেই সম্ভব।

রাষ্ট্রের উন্নয়নে এবং মানুষের কল্যাণে, জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে সদা নিয়োজিত এক অরাজনৈতিক ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের এক ফলিত রূপ হলো আর এস এস। ভারতীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' ও 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' মন্ত্রে দীক্ষিত এক স্বয়ংসেবক। এহেন মোদীজীকে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং তৃণমূল সাম্প্রদায়িক তকমায় বিঁধে উঠতে বসতে গালাগাল করছে অথচ মোদীজীকে মুসলমান জগতের আরবের রাজা ২০১৬ সালের ৩ এপ্রিল সেই দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দিয়েছে। প্যালেস্তাইনও ২০১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মোদীজীকে বিশেষ সম্মান দিয়েছে। 'সক্রিয় মোদীর জন্য ভারত এগুচ্ছে'— একথা কোনো মোদী সমর্থকের নয়, একথা পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুসারফের। পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার মুসলমান রমণী মোদীজীকে রাখি পাঠাচ্ছেন। মোদীজীর ভূমিকাকে প্রশংসা করে আরব আমিরশাহির সেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আলনায়ান মোদীজীকে সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'জায়েদ মেডেন' সম্মান ভূষিত করেছেন।

এহেন প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যখন এক শক্তিধর ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে রূপান্তরিত হতে চলেছে, যিনি দেশের ও জনগণের কল্যাণে নিজের সংসার ধর্ম ত্যাগ করেছেন, যাঁকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানব কল্যাণে নানান প্রকল্প বিশেষ করে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর জন্য 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' ঘোষণা করেছে, সিউল পিস ফাউন্ডেশন শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে এবং রাশিয়ার মতো শক্তিধর রাষ্ট্র রাশিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অর্ডার অব সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টেল' দিচ্ছে, যিনি জঙ্গি নিকাশে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ঘটিয়েছেন, অ্যান্টি সাটেলাইট মিসাইল এবং সাবসোনিক ক্রুজ মিশাইল নির্ভয়-এর সফল উৎক্ষেপণ করিয়েছেন যা পাকিস্তান ও চীনের কপালে চিন্তার ভাঁজ এঁকেছে। তিনি তো দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে এক মূর্ত প্রতীক।

তাঁকে সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিগ্রস্ত বলা চোরের মায়ের বড়ো গলার মতো এবং আকাশে থুতু ফেলা যা নিজের গায়েই এসে পড়ে। ভারতের চৌকিদার মোদীজীর নেতৃত্বে দেশদ্রোহী, স্বার্থান্বেষী, গরিবের টাকা লুণ্ঠনকারীরা যখন একের পর এক জেলে যাচ্ছে তখন ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলির নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে বাঁচাতে মহাজোট গঠন করে মোদী হঠাওয়ের পরিকল্পনা চাণক্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি যথার্থই বলেছেন— চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাশ যখন এক হয়ে রাজার বিরোধিতা করবে তখন জানবে রাজা সঠিক পথে এগুচ্ছেন। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



২০ মে (সোমবার) থেকে ২৬ মে (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে শুক্র, বৃষে রবি, বুধ, মিথুনে রাহু, মঙ্গল, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে কুম্ভে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতায় পাণ্ডিত্য অর্জন, সৃজনশীল ও জনহিতকর কাজে উৎসাহ, সন্তুষ্টি ও বন্ধুত্বের নতুন সম্পর্ক স্থাপন। খনিজ দ্রব্য নির্মাণ শিল্প, পরিবহণ ব্যবসায় শুভ সপ্তাহ। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের মেলবন্ধনে প্রশংসিত হবেন। উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাস। ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান। শরীরের মধ্যভাগের চিকিৎসা প্রয়োজন।

বৃষ ঃ দৈব দুর্ঘটনা, আইনি জটিলতায় হতাশার মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত। কর্ম বাধার মধ্যে সম্পন্ন। বিনিয়োগ ও ভ্রমণ স্থগিত রাখুন। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণ ও মনের সুপ্ত বাসনার পূর্তি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে মূল্যবোধ উদারতা দৃষ্টির সপ্রতিভায় সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের প্রকাশ। প্রভাব, প্রতিপত্তি, মান-সম্মান লাভে বিরোধিতা হার মানেব।

মিথুন ঃ অভিমান, হঠকারিতায় মতান্তর ও বন্ধুবিচ্ছেদ। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা দূর হবে। হঠাৎ বিবাহযোগ। শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলী ভাস্কর্যের সৃজনীশক্তির পরিসর, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব বৃদ্ধি। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে বৈভব ও শ্রীবৃদ্ধি। মস্তকে আঘাত, নিকট ভ্রমণ ও পরিজন সুখ।

কর্কট ঃ কুটুম্বের কুটিলতায় দাম্পত্য অসন্তোষ। নতুন নতুন কাজের খবরে উৎসাহ ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। আর্থিক শ্লথ গতি, জরুরি প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ। ভ্রাতা, ভগ্নীর কর্মসংক্রান্ত সুখবর, পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি। গুরুজনের পরামর্শে নতুন আঙ্গিকে চলার দিশা। মিত্রস্থান হিতকারী নহে।

সিংহ ঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর অসহযোগিতা, ভুল বোঝাবুঝি, মানসিক ক্লেশ। মাতৃস্থানীয়ার আচমকা অসুস্থতা ও সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব। রমণীর সখ্য, বিলাস-ব্যসনে সময়ের অপচয়। চাকুরিজীবীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও চাপ। পুরানো গৃহ সংস্কার ও বাহন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা শ্রেয়। সপ্তাহের শেষভাগে কর্মোপলক্ষ্যে ভ্রমণ। পারিবারিক অতিরিক্ত চাহিদায় আয়-ব্যয়ের সমতা নষ্ট।

কন্যা ঃ ব্যবসায় অসতর্কতার কারণে অর্থদণ্ড। ম্যানেজমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, টিভি, ফিল্ম বা সংগীত শিল্পীদের পেশাগত উন্নতি। সাবলীল আর্থিক গতি। স্পষ্টবাদিতায় ও ভাবাবেগে একাধিক ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। একাধিক সূত্রে অর্থ আয়ের যোগ।

তুলা ঃ কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব সচেতনতা ও সৃষ্টিধর্মী বা গঠনমূলক কাজে সাফল্য। বহুদিনের পুরানো পারিবারিক সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা। বিদেশি পরিজনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় শুভ ইঙ্গিত। বন্ধু ও স্বজনের আর্থিক সহায়তা প্রদান। পরিবারে সদস্যবৃদ্ধির যোগ।

বৃশ্চিক ঃ জ্ঞান-মেধা, কর্তব্যপরায়ণতা ও মিষ্টতায় মানী-গুণী ও পরিজন পরিবৃত সুখী গৃহকোণ। অনুভবী, উদারতা, সুন্দরের পূজারি ও সামাজিকতায় মানবিকতার প্রকাশ। গৃহ ও বাহন যোগ। ভ্রাতা-ভগ্নীর ভাবনায় শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা। গৃহশ্রীর হঠকারী সিদ্ধান্তে শান্ত ও সংযত থাকুন।

ধনু ঃ দুরূহ কাজে কঠিন পরিচয়ে দীর্ঘদিনের মনোবাসনার পূর্তি। স্থগিত কোনও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অপ্রিয় সত্যকথনে সহানুভূতি ও শংসা প্রাপ্তি। পারিবারিক সুস্থিতি ও বিদ্যার্থীদের সপ্তাহটি বিশেষ ফলদায়ক। পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমের পূর্ণতা। সন্তান-সন্ততির রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি।

মকর ঃ পরিবারের কোনও সদস্যের বিরূপ আচরণ ও রমণীর কুহকজালে ভাবপ্রবণতা পরিহারে সম্মান রক্ষা করুন। আর্তের সহায়তা, গৃহসজ্জা ও বিলাস দ্রব্য ক্রয়ে ঋণী হতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তায় জীবনে চলার স্বাভাবিক ছন্দ বজায় থাকবে। বিভাগীয় পরীক্ষা ইন্টারভিউতে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে বিলম্ব।

কুম্ভ ঃ নতুন সম্পত্তি ক্রয়, কৃষিকাজে, সামাজিক কাজকর্ম, তীর্থভ্রমণ, নবনির্মাণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ। মাতার স্বাস্থ্য ও সন্তানের পড়াশুনা বিষয়ে উদ্বেগ। অর্থ-বিত্ত ও প্রাচুর্যে দিন যাপন। কর্মে নানাবিধ প্রতিকূলতা ও স্বজন বিচ্ছেদে মনঃকষ্ট। সপ্তাহের শেষভাগে গৃহসুখ। ভ্রাতা-ভগ্নীর জীবিকার নতুনত্বে গর্ব ও আনন্দ।

মীন ঃ বন্ধুপ্রিয়তা, মান্যতা, পাণ্ডিত্য প্রভাবে খ্যাতি, বৈভব, দৃঢ় প্রত্যয়ে সাফল্য ও আধিপত্য। গৃহে পুণ্যকর্ম, স্ত্রী-পুত্রের মনস্কামনা পূরণ। বিদ্যার্থী ও গবেষকদের শংসা ও স্বীকৃতি লাভ। স্ত্রীর কর্মযোগ অথবা পেশাগত দক্ষতায় শংসা, খ্যাতি। তবে বাসস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য